স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজীবন-কাহিনী অতি অল্প-পরিসরে এ গ্রন্থে আমরা বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি। একথা স্বীকার করছি যে, এ তাঁর বিস্তৃত জীবন-কাহিনী নয়। বাংলার তরুণসমাজের সম্মুখে বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সে-লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণী যথাসম্ভব সংক্ষেপে উপস্থিত করব—বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সেইটি আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল,—সে আকাঙ্ক্ষা কতখানি সফল হয়েছে বলতে পারি না। তবে, এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সমস্যাপীড়িত আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্বর জীবনের দিকে তরুণসমাজের কতকাংশকেও যদি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হই তবেই শ্রম সার্থক মনে করব।—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ., পিএইচ. ডি. মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক এ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে এর মূল্য বৃদ্ধি করেছেন এবং আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।.. বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ. মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করলেন। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শুক্লা দ্বিতীয়া,
ফাল্গুন, ১৩৫৬
কলিকাতা।

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

মুখবন্ধ

গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যের দিনে পরপদদলিত লাঞ্ছিত এই দেশে যাঁহারা নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। হৃতগৌরব ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ উদ্ধার করিয়া একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্ত্য জগৎ চমৎকৃত করিয়া তাহাকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা জাগাইয়া তাহার নূতন জাতীয় জাগরণের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর যে জাতীয় আন্দোলন স্বাধীনতায় পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব উপদেশ। আমাদের দেশের লোক ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনৈতিক বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইংরেজের চোখে তাহা এড়ায় নাই। তাই একাধিক ইংরেজ লেখক স্বাদেশিকতার দিনে বিবেকানন্দকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ ঠিক না হইলেও ইহার মূলে অনেকটা সত্য আছে।

বিবেকানন্দ ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—কিন্তু তাঁহার জীবন, কার্যকলাপ ও উপদেশ ঠিক সন্ন্যাসীর মত ছিল না। তিনি দুর্গম গিরিগুহায় কঠোর সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত না করিয়া দেশের দুঃখদুর্দশা, অজ্ঞতা, অত্যাচার ও অবিচার দূর করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যবর্গকেও মানুষের সেবাধর্মেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা এখন বেশী দরকার, যিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়ির মধ্যে, যিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দরিদ্রনারায়ণসেবাকে কৈবল্যমুক্তি অপেক্ষাও উচ্চতর আসন দিয়াছিলেন—তিনি কি সন্ন্যাসী?

বিবেকানন্দ ধর্মকে মানুষের সাংসারিক জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। সকল কাজের মধ্য দিয়াই ধর্ম আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ। তাই তিনি উদাত্তস্বরে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন প্রকৃত মানুষ হইতে।

আজ দেশের নূতন পটভূমিতে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইতেছি। স্বাধীনতা লাভের চেয়েও যে মানুষ হওয়া বড় কথা আজ আমরা তাহা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছি। আজ ভারতে মানুষ নাই। তাই স্বাধীনতা পাইয়াও আমরা প্রকৃত কোন উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। স্বার্থবুদ্ধি ও দ্বেষহিংসা সারা দেশ জুড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না—যদি আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব না হয়। আজ তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দেশের সম্মুখে আবার ধরিতে হইবে। তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার উপদেশ-বাণী মনে রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।

এই কারণেই এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের দেশের সর্বসাধারণের—বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের মহৎ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী খুব চিত্তাকর্ষক—শুষ্ক নীরস উপদেশের পরিবর্তে পাঠকবর্গ ইহাতে উদ্দীপনাময় ভাবের সন্ধান পাইবেন এবং স্বামীজির চিত্র অলক্ষ্যে তাঁহাদের মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইবে। নাট্যরচনা-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার পর পর এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, যাহাতে পড়িবার উৎসাহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, অথচ স্বামীজির জীবনী ও উপদেশের মূল সূত্রগুলি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। গ্রন্থকার ভক্তের হৃদয় ও কবির কল্পনা লইয়া যে আলেখ্য আঁকিয়াছেন তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। ভাবের উচ্ছ্বাস ও ভাষার সাবলীল গতি সমস্ত কাহিনীকে একটি মাধুর্য দান করিয়াছে। আমি আশা করি বাংলার প্রতি যুবক এই গ্রন্থপাঠে স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং এই যুগাবতারের পূত কাহিনী পাঠ করিয়া নিজে ধন্য হইবেন এবং দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জননী জন্মভূমিকে ধন্য করিবেন।

কলিকাতা

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সূচী

স্বামী বিবেকানন্দ

[প্রথম পর্যায়]

বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী।

সেই পুণ্য শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বাংলার মাটিতে যে বিরাটপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন, বাংলার হৃৎপদ্মসম্ভব হয়ে—ভারতবর্ষের লুপ্ত-গৌরব যিনি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে,—

তমসাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত জাতিকে যে পুরুষ-সিংহ প্রচণ্ড আঘাতে জাগ্রত করেছিলেন কর্মসাধনা ও সেবাধর্মের মধ্যে—

সেই সিংহবীর্য, হৃদিবান্-মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা আজ সংক্ষেপে বাংলার তরুণ সমাজের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করছি।

কিন্তু, এ তাঁর বিস্তৃত জীবনকাহিনী নয়, বিশদ কোন ইতিহাসও নয়।

তাঁর বিস্তৃত বিচিত্র জীবনকাহিনী পাঠ করলে, অনুধ্যানে উপলব্ধি করে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলে কল্যাণ হবে দেশের, কল্যাণ হবে জাতির, সংকট-সংকুল জীবনপথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবার অভ্রান্ত নির্দেশ পাবে আজিকার সংশয়-পীড়িত বহুধা উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ সমাজ—এই আমাদের বিশ্বাস।

*　　　*　　　*　　　*

তাঁর পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত।

বিবাহ করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি চিরকাল অনাসক্ত, আজীবন সংসার-বিরাগী।

একটিমাত্র পুত্রের জন্মের পরেই অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ, সর্বত্যাগী তিনি সন্ন্যাসী।

এ জগতের ভোগসুখের চাইতে ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা উগ্রতর হয়ে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, ব্যাকুল করেছিল। তাই, ভারতের জনারণ্যে মিশে গিয়েছিলেন তিনি গৃহত্যাগী উদাসীন বেশে।

এর অনেক বৎসর পরে দৈবাৎ কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির-পার্শ্বে নিজ পত্নীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল দুর্গাচরণের।...

সেদিন বর্ষাসিক্ত পিচ্ছিল চত্বরে পদস্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা।

দূর থেকে তাই দেখে দয়ার্দ্র হয়ে ছুটে গেলেন তাঁকে সাহায্য করতে সংসার-বিরাগী এক উদাসী-সন্ন্যাসী। সযত্নে তুলে এনে তাকে শুইয়ে দিলেন ধীরে ধীরে সোপানের উপর।

সংজ্ঞা লাভ করে চোখ মেলে তাকালেন মহিলা। চারি চক্ষের মিলনে পত্নী চিনতে পারলেন স্বামীকে, স্বামী চিনলেন পত্নীকে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে, তিলেক বিলম্ব না করে গাত্রোত্থান করে অদৃশ্য হলেন সন্ন্যাসী।...

দ্বাদশ বৎসর পরে আরও একবার,—অতি অল্প কয়েকদিনের জন্য তাঁকে দেখা গিয়েছিল তাঁর জন্মস্থান বাংলায়, মহানগরী কলকাতায়।

কিন্তু সেই শেষবার।

লোকালয়ে আর তাঁকে কেউ কোনদিন দেখেনি। কোথায় কোন্ তীর্থে, কোন্ পুণ্যতোয়া নদীতটে, কি অবস্থায় তাঁর দেহত্যাগ ঘটেছিল কেউ জানে না।

* * * *

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সন্তান ও বিশ্ব-বিজয়ী সন্ন্যাসীর জনক, জীবন তাঁর সর্বথা ছিল দেবরক্ষিত।

জীবনের আদি শৈশবে,—তিনবৎসর বয়ঃকালে একদা মায়ের সঙ্গে নৌকাযোগে কাশী যাবার পথে অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়েছিলেন বিশ্বনাথ। কিন্তু অনুপম স্নেহশীলা তাঁর মা, নিজে সাঁতার না জেনেও, অমিত-সাহসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' পুত্রের প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেবার।

উত্তর জীবনে বিশ্বনাথ এটর্ণি হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে।

যেমন অগাধ অর্থ উপার্জন করতেন—তেমনি দরাজহাতে খরচ করতেন ঃ কার্পণ্য করতেন না, কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে, আশ্রিত-পরিজনে সর্বদা তাঁর গৃহ পূর্ণ থাক্‌ত। এক কথায়, মহামজলিসি লোক ছিলেন বিশ্বনাথ।

হাফেজের কবিতার মধ্য থেকে রস গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন, সুফী কবিরা তাঁর পরমপ্রিয় ছিল।

নিজে সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সঙ্গীতচর্চার দিকে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাইবেল পুরাণ তাঁর আদরের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল।

স্বাধীনচেতা, উদার-হৃদয়, আনন্দময় পুরুষ বিশ্বনাথ—বাইরে সংসারী হলেও অন্তরে অনাসক্ত ছিলেন, বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন।

* * * *

মাতা ভুবনেশ্বরী। সদা প্রফুল্ল কিন্তু শান্ত ও সংযতবাক্‌,—মাতৃত্বের অপূর্বপ্রকাশে মহিমময়ী।

বৃহৎ পরিবারের সবাই, প্রতিবেশী সকল নরনারী তাঁর স্নিগ্ধ মাতৃত্ব ও অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্বের কাছে সানন্দে মাথা নত করে থাকত।

সদাশিব স্বামীর স্বচ্ছল বিপুল সংসারের তিনি অধীশ্বরী। তবু কিন্তু অন্তরে বেদনা ছিল, তীব্র অভাববোধ ছিল একটি। তিন-চারটি কন্যা তাঁর কিন্তু তিনি পুত্রহীনা।

বাঞ্ছিত পুত্রকামনায় অন্তর তাই পিপাসিত ও চঞ্চল। বিশ্বনাথের পাদমূলে নিত্য প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করতেন পুত্রলাভের জন্য।

কালে সার্থক হয়েছিল তপস্যা, তুষ্ট হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর।

স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন 'তোর ঘরে, তোর পুত্র হয়ে জন্মাব আমি।'

* * * *

এখন থেকে প্রায় নব্বই বৎসর আগেকার এসব কথা।

গল্প নয়, উপকথা নয়;...ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট মসিচিত্রে অঙ্কিত বাস্তব কাহিনী। ধরিত্রীর বুকে জন্ম নিয়েছিলেন—তপস্যাতুষ্ট বীরেশ্বর—বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর পুত্ররূপে।

ডাকনাম তাই রাখা হয়েছিল 'বীরেশ্বর'। সংক্ষেপে, মুখে মুখে দাঁড়িয়েছিল 'বিলে'। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ।

উত্তরকালে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন, অমর হয়েছিলেন আর একটি নামে। সে নাম শোনেনি এমন বাঙালী কেউ নেই, এমন ভারতবাসী কেউ নেই। সে-নাম স্বামী বিবেকানন্দ অথবা শুধুই স্বামীজি।

অনিন্দ্যসুন্দর, সুঠাম, তেজস্বীবালক—যোগীর চক্ষু নিয়ে, শংকরের মেধা আর বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে—জন্মেছিলেন সংসারে, জন্মেছিলেন সুরধুনীর তীরে—আমাদেরই বাংলায়, ১৮৬৩ খৃীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রত্যুষ-প্রাক্কালে।

প্রচণ্ড সাহস, অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি ও চাঞ্চল্য—এই বৈশিষ্ট ছিল বালকের।

অতি শৈশবেই সমবয়সীদের নিয়ে চক্রাকারে সে 'ধ্যান, ধ্যান' খেলতে বসত। অন্য ছেলেরা দু-চার মিনিটেই চঞ্চল হয়ে উঠত, উসখুস করত—'বিলে' কিন্তু মুহূর্তে তন্ময় হয়ে যেত, ডুবে যেত।

বিষধর সর্প পাশ দিয়ে গেলেও তার হুঁস হত না, ধ্যান ভাঙ্গত না। এমনি ছিল তার ধর্মসংস্কার, এমনি ছিল তার ধ্যান-পরায়ণতা।

মায়ের কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে রামায়ণ-মহাভারতের পুণ্যকাহিনী, পুরাণ-ভাগবতের গল্পগাথা শুনতে শুনতে বালক তন্ময় হয়ে যেত। বর্তমানের আবেষ্টনী অতিক্রম করে দূর অতীতের কল্পলোকে মুহূর্তে তার কিশোর মন উধাও হয়ে ছুটে যেত। কথকতায় ও যাত্রাগানে রামভক্ত হনুমান 'অমর' বলে জানতে পেরে—সরল বিশ্বাসে বালক দিনের পরদিন কলা বাগানে, আম বাগানে বসে থাকত—মহাবীর হনুমানের তিলেকের দর্শন লাভের আশা নিয়ে।

আবার কুস্তীতে, লাঠিখেলায়, জিম্‌নাস্টিকেও সে ডানপিটে...সে দলের সর্দার ছিল।

স্কুলের বই যত পড়ুক আর নাই পড়ুক বাইরের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বই পড়ে জ্ঞান আহরণের ঝোঁক তার প্রচণ্ড ছিল—শৈশব থেকেই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা অনন্তমুখে প্রকাশিত হতে সুরু করেছিল এ কাল হতেই।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে ও কল্পনায় মিশিয়ে ভাবী-জীবনের চিত্র দেখতে পেত সে। চেষ্টা করে নয়, অমনি স্বতঃই ছায়াছবির মত চিত্রগুলি ভেসে আসত চোখের সামনে—ঘুম আসবার ঠিক আগটিতে।

একবার দেখত—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে রিক্তহস্তে গৃহত্যাগ করেছে সে—শঙ্করের মত, বুদ্ধের মত।

আবার দেখত—অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বিপুল মান-মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সংসারে।...

মুহূর্তে দুটি ছবিই আবার মিলিয়ে যেত।

ভিতর থেকে কে যেন তারপর প্রশ্ন করত। বলত, এ দুটোই হবার শক্তি আছে তোর ভিতর, ভেবে দেখ, কোন্‌টা হবি।

ধীরে সন্ন্যাসী হবার কল্পনাটাই যেন তার কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করত, সমগ্র চেতনাকে আবৃত করত—বালক ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন নয় দু'দিন নয়, প্রায় রোজই সে এদৃশ্য দেখেছিল—শৈশবের অনেকদিন ধরে। তার বিরাট ভাবী জীবনের ইঙ্গিত এমনি করে—জীবনারম্ভেই নির্দেশ করেছিলেন তার ভাগ্যবিধাতা।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, সেই সময়, সন ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে...একবার পিতার তদানীন্তন কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের 'রায়পুর' নামক স্থানে—পরিবারস্থ মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ভার পেয়েছিল সে। রেল লাইন তখনো সে-সব অঞ্চলে খোলা হয় নি। সে জন্য নাগপুরের পর থেকে দীর্ঘ পথ তাদের গো-শকটে অতিক্রম করতে হয়েছিল প্রায় সপ্তাহকাল ধরে।

নিসর্গের বিচিত্র-সৌন্দর্য-মণ্ডিত সে ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে নরেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই এক গভীর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করেছিল সে-সময়।

তারপর একদিন এক সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে অগ্রসর হবার সময় পথিপার্শ্বস্থ উত্তুঙ্গ পর্বতের গাত্র-ফাটল-বিলম্বিত এক বিশাল মধুচক্র নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রকৃতির নিভৃত নিরালায়, সর্ববিশালতার মধ্যখানে মধুমক্ষিকাদের সে অপূর্ব চক্ররচনা—এক অনাস্বাদিতপূর্বভাবে অভিভূত করেছিল নরেন্দ্রনাথকে।

বিশ্বনিয়ন্তার অপার মাহাত্ম্যের চিন্তায় সে এককালে বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য।

তার জীবন-চরিতকারগণ বলেন, প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে

প্রবেশ করে একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা সেই তার জীবনে প্রথম ঘটেছিল।...

অন্যদিকে...আর্তের সেবার জন্য, দুঃস্থের দুঃখ দূর করবার জন্য, যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে উচ্চ আদর্শ ও মহৎ লক্ষ্যে চালিত করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সংঘ-স্থাপনেও কিশোর বয়স থেকেই তৎপর ছিল নরেন্দ্রনাথ। তার চরিত্রের শুভ্রতার কাছে, সাহসের দৃঢ়তার কাছে নিষ্প্রভ অন্য ছেলেরা স্বতঃই তার নেতৃত্ব মেনে নিত—সর্বক্ষেত্রে ও সর্বসম্মতিক্রমে।

পাঠ্যজীবনে মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিল নরেন্দ্রনাথ। অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ব'লে শিক্ষক মহাশয়গণ বিরক্ত হতেন মধ্যে মধ্যে।

আবার নির্ভীক ও সত্যপরায়ণ বলে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর বলে, অসাধারণ মেধাবী বলে অত্যন্ত ভালও বাসতেন তাকে। পড়াশুনা, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা কোনটাই তার আর দশজনের মত নয়।

সারাবৎসর সহস্রবিধ কাজের তার অবধি নেই। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে ডুবে থেকে তার দিন কাটে।

কুস্তী ল'ড়ে শরীর মজবুত করে, ধ্যান করে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করে।...

আর সব পাঠ্যপুস্তক? সে-সব তখন তাকের উপরই তোলা থাকে। কিন্তু দৃঢ় শরীর ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে দু'চার-দিনেই সে প্রস্তুত হয়। এক রাত্রেই হয়ত চার খণ্ড জ্যামিতি আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিয়ে আসে।

এমনি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ তার সব কিছু।

'পাসের পড়া' তার কাছে অতি সামান্য, তুচ্ছ জিনিস। পাঠ্যপুস্তকের অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে তার বুভুক্ষু, জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটে না, তৃপ্তি আসে না।

দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সে তত্ত্ব আহরণ করতে চায়, সত্য জানতে চায়—অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে উপলব্ধি করতে চায় মানবের জীবন-রহস্য।

কে যেন তাকে বলে; প্রায়ই বলে—সেই মন্ত্র, যে-মন্ত্র পরবর্তীকালে বজ্রনির্ঘোষে সে নিজ দেশবাসীকে শুনিয়েছিল

চরৈবেতি, চরৈবেতি—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।' ওঠ, জাগ, লক্ষ্যে পেঁছাবার আগে থেম না।

তাই ধ্যানে ও বিদ্যাচর্চায় সে মন ও বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করতে চায়। দেহটিকে দৃঢ় ক'রে—কর্মের জন্য প্রস্তুত হতে চায়। নিরলস, অক্লান্ত তার সাধনা, অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সদা উদ্বেলিত তার মনপ্রাণ!

* * * *

তার উপস্থিতবুদ্ধি ও দুর্দম সাহসের ছোট একটি গল্প এখানে বিবৃত করি।

পাড়ার জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়ায় একটা ট্রাপিজ খাটাবার দরকার হল একদিন। নরেন তার দলবল নিয়ে খুব মেতে উঠল ট্রাপিজ খাটাতে। কিন্তু বিরাট ট্রাপিজের গুরুভার ফ্রেম কিছুতেই দাঁড় করাতে পারল না।—

একজন বলবান ইংরাজ পুরুষ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেদের মজা দেখছিল। নরেন সহসা গিয়ে তাকেই অনুরোধ করল সাহায্য করবার জন্য।

সাহেব রাজী হয়ে ট্রাপিজের গোড়াটা পায়ে চেপে ধ'রে মাটিতে ঢোকাতে শুরু করল, আর তার মাথার দিকে দড়ি বেঁধে ছেলেদের বলল টেনে তুলতে। মহা উৎসাহে প্রাণপণ শক্তিতে টানছে ছেলেরা—হাঁই মারো, মারো টান্।...

অনেকটা উঠে গেছে ট্রাপিজ, আর একটু হলেই সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমনি সময়ে অকস্মাৎ দড়িটা ছিঁড়ে গেল আর ট্রাপিজের গুরুভার ফ্রেমটা ভীষণ শব্দে মাটিতে গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তে গোড়ার দিকটা উপরে ছিটকে উঠে সাহেবের কপালে বিষম চোট লাগিয়ে দিল।...

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সাহেব। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটা।

ছেলেরা ভাবল সাহেব মরেই গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভীতত্রস্ত হয়ে যে যেদিক পারল ছুটে পালিয়ে গেল—শুধু ছেলেরাই নয়, আশেপাশে বয়স্ক যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও।

কিন্তু স্থিরবুদ্ধি নরেন তখুনি নিজের বস্ত্র ছিন্ন করে সাহেবের মাথায় পটি বেঁধে দিল। দু'একজন সঙ্গীর সাহায্যে অশেষ যত্নে সাহেবের জ্ঞান ফেরাল—মাথায় জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে।

তারপর তাকে পার্শ্ববর্তী এক গৃহে স্থানান্তরিত করে, ডাক্তার দেখিয়ে, সাত-আটদিন ধরে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সুস্থ করে বিদায় দিল। আবার, পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহ করে হাতখরচের জন্য কিছু অর্থও দিয়ে দিল সাহেবকে বিদায় দেবার প্রাক্কালে।

এমনি করেই বিপদের সামনে স্থির হয়ে সে দাঁড়াত শিশু বয়সেই। একবার দু'বার নয়—বহুবার এ-জাতীয় পরীক্ষা তার সম্মুখে এসেছিল শৈশবকালেই—কিন্তু পরীক্ষা যত কঠিনই হোক, বিপদ যত ঘনীভূতই হোক, ভয়ে পেছিয়ে যাবে অমন বান্দাই ছিল না নরেন্দ্রনাথ।

*　　　*　　　*　　　*

ধ্যান করতে বসে অতি অল্প বয়সেই যে সে তন্ময় হয়ে যেত, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলত—সেকথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু কতটা তন্ময় হত—তারই একটা কাহিনী এখানে বিবৃত করব।

ধ্যান করতে বসে সে মনকে বলত,—মন তুমি একেবারে চিন্তাশূন্য হয়ে, নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির, ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাক।

সংযত, ধ্যানসিদ্ধ মন তার তাই থাকত।

গৃহে দ্বার রুদ্ধ করে এমনি ধ্যান করতে করতে একদিন হঠাৎ সে দেখেছিল এক অপূর্ব দীর্ঘ সন্ন্যাসী মূর্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরিধানে তাঁর গৈরিক, হাতে কমণ্ডলু;—

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কী অনুপম করুণা!

কিশোর নরেন দেবদর্শন লাভ করেছিল সেদিন—সেই বয়সেই। কিন্তু কে সে দেবতা? কার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিল সে?

আমরা জানি না, নরেনও জানে না।—

তবে সে বলত, জীবনের প্রান্তে গিয়ে—যখন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ বলে, অবতারকল্প ঋষি বলে সে জগৎপূজ্য হয়েছিল তখনও বলত—

'হতে পারে ভ্রম, কিন্তু তবু আমার মনে হয়—বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে আমি সেদিন ধন্য হয়েছিলাম।'...

আরও একটা খেয়াল ছিল নরেন্দ্রের শৈশবজীবনে।

যখনই কোন মহাপুরুষের কথা শুনত সে, বিশেষ করে ধর্মজগতের, তখনই তাঁকে দেখবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেত।

কিন্তু ফাঁকা কথা বা বৃহৎ বুলি সে বেশীক্ষণ সইতে পারত না। সোজাসুজি সামনে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করে বসত

'আপনি যা উপদেশ দিচ্ছেন তা নিজে উপলব্ধি করেছিন কি? ভগবানকে স্বয়ং দর্শন করেছেন কি?'

আর উত্তর শুনে সব জায়গা থেকেই সে নিরাশ হয়ে ফিরে আসত। 'ভগবান দর্শন করেছে,'—এমন কথা কেউ বলতে পারত না।

এমনিভাবে, একবার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গ্রীনবোটের ভিতর সে প্রবেশ করেছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিল জ্ঞানবৃদ্ধ সে মনীষীকে সেই একই প্রশ্ন,—'ভগবানকে কি আপনি স্বয়ং দর্শন করেছেন?'

প্রবীণ মহর্ষি অপরিচিত এক কিশোরের আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়েছিলেন, বোধ করি খানিকটা বিমূঢ়ও হয়েছিলেন সেদিন। তারপর অকপটে বলেছিলেন—'না বৎস, আমি তাঁকে দেখিনি! কিন্তু তোমার চক্ষু যোগীর চক্ষু, তুমি ধ্যান অভ্যাস কর, হয়ত তুমিই সাক্ষাৎ পাবে ভগবানের।'

এইরূপে শত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শৈশব ও বাল্য পেরিয়ে কৈশোরের প্রান্তে উপনীত হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ।...

এর মধ্যে এন্ট্রান্স পরীক্ষাও পাস করেছে সে এবং তখনকার জেনারেল এসেম্ব্রি ইন্‌স্টিটিউসনের ছাত্র হিসাবে এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে হেস্টি সাহেব তখন ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়। ধর্মপ্রাণ ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন হেস্টি সাহেব। নরেন্দ্রনাথদের শ্রেণীতে একদিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াতে এসে প্রসঙ্গতঃ তিনি উল্লেখ করেছিলেন ভাব-সমাধির কথা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারী রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের কথা, তাঁর ভগবানের নামে মুহুর্মুহু ভাব-সমাধির কথা। তাঁর নাম তখন কলকাতায় সকলের মুখে মুখে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের বিশেষ আলোচনার বস্তু।

নরেন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে শুনল। ভাবতে লাগল মনে মনে—কে এই রামকৃষ্ণ? কতদূরে দক্ষিণেশ্বর? তিনি কি তবে দেখেছেন ভগবানকে? উপলব্ধি কি করেছেন ধর্মতত্ত্ব?...

ভাবতে থাকে। ব্যাকুল হয়ে, উন্মনা হয়ে ভাবতে থাকে নরেন্দ্রনাথ। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তার অন্তরে সেই পাগল পূজারীকে দেখবার জন্য।...

দিন যায়, মাস যায়। ব্যাকুলতা বাড়তেই থাকে, অতৃপ্ত ঐকান্তিক পিপাসা চরমে শুভ মুহূর্তটিকে এগিয়ে নিয়ে আসে।

তারপর একদিন সত্যি দেখা হয়।

নিজের বাহ্যিক কোন প্রচেষ্টায় নয়,—পরন্তু ঘটনার অনিবার্য যোগাযোগে, আর দৈব-নির্দেশে দেখা হয়। প্রথমে, পাড়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক প্রতিবেশী ভক্ত-বাটিতে। তারপর, গঙ্গার তীরে সেই প্রখ্যাতনামা দেবদেউলে—দক্ষিণেশ্বরে; ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে, হেমন্তের বিদায় মুখে।

ভাব-পাগল, দিব্যোন্মাদ রামকৃষ্ণ দেখেন নরেন্দ্রকে—বিশেষ করে দেখেন তার চোখ, মুখ, অঙ্গলক্ষণ।

ভাবেন মনে মনে, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধারের জন্ম কেমন করে সম্ভব হল!

কিয়ৎক্ষণ পরে কি মনে করে আবার একটা গান গাইতে অনুরোধ করেন তাকে।

বাংলা গান তখনও নরেন্দ্রনাথ বেশী শেখেনি। তবু অনুরোধ এড়াতে না পেরে স্বভাবসিদ্ধ তন্ময়তায় গান গায় নরেন্দ্রনাথ।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে—
ভ্রম কেন অকারণে?

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন, কর আরোহণ—
জ্ঞানের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।...

গান শুনতে শুনতেই সমাধিস্থ হন শ্রীরামকৃষ্ণ।...বিস্মিত হয়ে, স্তম্ভিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ দেখেন রামকৃষ্ণকে, দেখেন তাঁর সেই অদ্ভুত অলৌকিক অবস্থা!

তাঁর ভাব-সমাধির কথা, ভগবানের জন্য সর্বত্যাগের কথা ইতিপূর্বে তিনি শুনেছেন,—আজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনে কণ্টকিত হয় তাঁর দেহ-মন, অভিভূত হয় তাঁর সমগ্র চেতনা!

কিন্তু কি বিশেষ চিন্তা-প্রবাহে, কী গভীর ভাবাবেগে তাঁর অন্তরপ্রদেশ যে আলোড়িত হয়েছিল সেদিন, তা সঠিক নির্ণয় ক'রে আমরা বলতে পারিনে, তিনি নিজেও কখনো বিশদ করে সে কথা কাউকে বলেন নি।

শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-লেখার অক্ষয় লিপিতে চিহ্নিত হয়ে যায় সেই প্রথম মিলনের পুণ্য দিনটি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শের মূর্ত-বিগ্রহ, বিশ্বাস ভক্তি ও নির্ভরতার ঘনীভূত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে,—আর তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূতন যুগের তরুণ প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-প্রণালীতে বিশ্বাসী, যুক্তি-বিচার ও প্রত্যক্ষমাত্রে আস্থাবান—সংশয়-পীড়িত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ নরেন্দ্রনাথ।

সে এক অদ্ভুত পরম মুহূর্ত,—শুধু ঐ যুগ্মজীবনের পক্ষেই নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে, মানব সভ্যতার ভাবীকালের পক্ষে।

এখানেও কিন্তু সেই একই প্রশ্ন নির্গত হল নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে—ভগবানকে কি দেখেছেন রামকৃষ্ণ? ধর্মতত্ত্ব কি উপলব্ধি করেছেন জীবনে?...

হাঁ, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবানকে, স্পর্শ করেছেন সেই পরম পুরুষকে।...নরেন্দ্রনাথকেও দেখাতে পারেন, স্পর্শ করাতে পারেন—যদি সে তাঁর কথা মত চলে।...

একি স্পষ্ট, নির্ভীক উক্তি! জীবনে এমন কথা কখনো শোনেননি নরেন্দ্রনাথ, জীবনে এমন ব্যক্তিও কখনো দেখেননি তিনি।

আলোড়িত হল, সম্যক্ আলোড়িত হল সমগ্র অন্তর তাঁর। একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় অনুভূতি, অনাস্বাদিতপূর্ব একটা অপূর্ব উন্মাদনা গ্রাস করল যেন তাঁকে।...

আবার পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণের সে কী আকুল আবেদন, সে কী অপ্রত্যাশিত স্তুতি-প্রকাশ!

'এতদিন পরে কি আসতে হয়? তোমার জন্য কেমন প্রতীক্ষা করে রয়েছি আমি...সে কি একটিবার ভাবতে নেই?'

সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেম-মিশ্রিত সে কী বন্দনা—'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ—জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে শরীর ধারণ করেছ।'...

এমনি কত কথা, বিগলিত স্নেহধারার কত অনবদ্য প্রকাশ!—সব বুঝতে পারলেন না, ধরতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ।...

কিন্তু স্তম্ভিত হলেন, বিস্মিত হলেন। সেই স্বর্গীয় সরলতা, নিঃসংশয় ভগবদ্বিশ্বাস মুগ্ধ করল তাঁর মনপ্রাণ, দীপ্ততেজে উদ্ভাসিত সেই জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল—এক দিব্য আকর্ষণের সৃষ্টি করল অন্তরে।

গভীর চিন্তা ও অবর্ণনীয় একটা মনোভাব নিয়ে গৃহে ফিরেছিলেন সেদিন নরেন্দ্রনাথ।

কিন্তু সে দেবমানবের অনিবার্য প্রেম-আকর্ষণ অতি শীঘ্র তাঁকে টেনে নিয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে—দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, আরও কতবার কে জানে?

এমনি করে দিনে দিনে চলল যাতায়াত। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল সম্পর্ক এবং একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় বৎসর সেই দুই যুগমানবের সম্বন্ধসূত্রে ক্রমশঃ যে-কাহিনী বিরচিত হল—দান ও গ্রহণের মাধুর্যে, সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্মতর তত্ত্ব-

সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মহিমায় সে মহিমান্বিত হয়ে রইল ভারতবর্ষের—তথা, বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়!

শুধু তাই নয়, আরও হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং স্ফটিকোজ্জ্বল জীবনাদর্শে নরেন্দ্রের সহস্রদল হৃদ্‌পদ্ম এক বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিত্র সুষমায় বিকশিত হতে সুরু করল।

পরিপূর্ণ আনুগত্যে নরেন্দ্রনাথ- দৃপ্ত তেজস্বী সিংহবীর্য নরেন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ করল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে।

দেখতে দেখতে বানের মুখে ফেনার মত, খড়ের কুটার মত চকিতে ভেসে গেল সংসার সমাজ ও পরিবার। দূর কোন্ দিগন্তে নিঃশেষে অবলুপ্ত হল জাগতিক প্রতিষ্ঠার কামনা, নামযশ প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা।—কিন্তু কেমন করে সেটি সংঘটিত হল--বহুর মধ্যে, তারই একটি অনবদ্য কাহিনী এখানে বিবৃত করছি।

পিতা বিশ্বনাথ তখন সদ্য লোকান্তরিত হয়েছেন। ফলে, বিধবা জননী আর অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই-বোনদের নিয়ে একটা বিপুল সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন উপার্জনহীন নরেন্দ্রনাথ।

রৌদ্রস্নাত, আনন্দের উচ্ছল সংসারে অকস্মাৎ যেন অর্থকষ্টের নিদারুণ অন্ধকার নেমে এসে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে।...

বাস্তবজগতের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে অর্থোপার্জনের বিফল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এবং তার স্বার্থপূর্ণ নগ্নরূপ নরেন্দ্রনাথের আজন্ম-বর্ধিত সকল ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করেছে। চারদিকে কেবল ব্যর্থতা আর অন্ধকার, সংশয় আর হতাশা।...

নিরুপায় নরেন্দ্রনাথ একদিন শেষে রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরে বসেন তার সে দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দিতে। বলেন,—আপনার 'মা'কে বলে আমার মা ও ভাইদের অন্নকষ্ট দূর করে দিন।—ওদের কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারি না।...

কিন্তু ঠাকুর তাতে সম্মত হতে পারেন না। করুণার্দ্র হয়েও বলেন,... ওরে, ও-কথা যে আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। কখনো হয়নি।—তুই মাকে

মানিস না, তাই তোর এত কষ্ট। তুই নিজে গিয়ে মা'র কাছে বল—সব কষ্টের অবসান হবে তোর।...

'সে আমি পারব না।' প্রতিবাদ করে নরেন্দ্রনাথ। বলে, 'আমি মাকে জানি না, মানি না। আমার কথা তিনি শুনবেন না। আমার জন্য আপনাকেই বলতে হবে।'...

ভালবাসার এমনি আবদার এড়াতে না পেরে শেষে বাধ্য হয়েই যেন বললেন ঠাকুর, 'আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি, আজ তুই নিজে গিয়ে মা'র কাছে যা চাইবি তাই পাবি।...তিনি ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন?'

অবশেষে তাই স্থির হয়। সন্ধ্যারতির পর কালীমন্দিরে মা'র কাছে নিজমুখে বর প্রার্থনা করতে রওনা হন নরেন্দ্রনাথ—নিঃসঙ্গ, একাকী।...

*   *   *   *

নিস্তব্ধ কালীমন্দির সেদিন একেবারে জনহীন। স্তিমিত দীপশিখায় অর্ধালোকিত সে-দেবদেউল। বরাভয়করা মহামায়া প্রত্যক্ষ সেথায় বিরাজমানা।...

উদ্বেলিত অন্তরে নরেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখেন সে দেবী প্রতিমার অপার্থিব বিগ্রহ। জীবন্ত, জাগ্রত।...মুহূর্তে তিনি আত্মহারা হয়ে যান, বিহ্বল হয়ে পড়েন। নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায় মহাকালের বুকে নৃত্যপরা, হাস্যময়ী মহাকালীর সঙ্গে সত্য সত্যই এমনি করে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে—রামকৃষ্ণের অহেতুকী, অপার্থিব করুণায়।...

কীসে অবাচ্য অনুভূতি! কীসে অপূর্ব, অক্ষয় মুহূর্ত! নরেন্দ্রনাথ নিজেকে নিঃশেষে মায়ের পায়ে নিবেদন করে দেন। ভূলুণ্ঠিত হয়ে বলেন, মা, জ্ঞান দাও, বিবেক-বৈরাগ্য দাও, তোমার অবাধ দর্শনের অধিকারী করে দাও!...ইহজীবনে আর আমার কিছু কামনা নেই, আর কিছু চাইবার নেই।...

আর মা!...মা তাঁর চিহ্নিত সেবকের সে অকপট প্রার্থনা সর্বাংশে পূর্ণ করে দেন অতি অল্পকাল মধ্যে। তখন—

কেবল একটি মাত্র কামনা, একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা সকল কামনাকে

আবৃত করে, অতিক্রম করে উদগ্র হয়, প্রচণ্ড হয় তাঁর জীবনে। 'সমাধিসুখ লাভ করব, মাকে জানব, নিরবধি দর্শন করব।' অবশ্য সেও বেশীদিন নয়।

ধীরে ধীরে সে কামনাও বিসর্জন দিতে হয় তাঁকে—রামকৃষ্ণের নির্দেশে, রামকৃষ্ণের করুণাঘন জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণায়।...

ত্রিসংসারে যাদের কেউ নেই—সর্বহারা নিঃস্ব যারা,—যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেবল ধনীর ধন জুগিয়েছে, বিলাস জুগিয়েছে, নিজেরা অনাহারে থেকেও বিত্তশালীদের অন্ন জুগিয়েছে যারা—তাদের চোখের জল মোছাবার জন্য, ব্যথা দূর করবার জন্য,...

বহু-যোজন-প্রসারিত-শাখা, বিশালাকৃতি বনস্পতির পত্র-ছায়াতলে তাপিতজন যেমন আশ্রয় পায় রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্নে, তেমনি করে দাবদগ্ধ সংসারে শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া বহুধা বিস্তৃত করবার জন্য...

আর,...সুপ্তিমগ্ন, দাসত্বলাঞ্ছিত ভারতবর্ষকে কল্যাণকর্মে জাগরিত করবার জন্য...

সমাধির পরমানন্দকেও তুচ্ছবোধে দূরে সরিয়ে রাখতে উদ্দীপ্ত করলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে।

বললেন, "নিজের মুক্তিকামনা, সেও ত কামনা, সেও ত স্বার্থপরতা। নিজের জন্য সমাধিসুখলাভ সেও ত নিছক ব্যক্তিগত কথা—বিপুল বিশ্বে নিরবধি-কাল-প্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়?...তুই হবি বিরাট বট-বৃক্ষের মত, শতসহস্র যোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা-প্রশাখা!

সংসারে দুঃখপীড়িত দুর্বল যারা, ব্যথিত আর্ত যারা,—তারা এসে তোর জীবন-মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি লাভ করবে। সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত হবে তোর জীবন। তোর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে সংশয়-পীড়িত নর-নারী সাহস সঞ্চয় করবে, বললাভ করবে।"

এইভাবে, মহামায়ার মহতী ইচ্ছার বেদীমূলে—'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' নরেন্দ্রকে উৎসর্গ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পুরাতনের দুর্লভ উপকরণে জগতে নূতন জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব হল। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন মানব-কল্যাণব্রত বিবেকানন্দে।

কিন্তু একদিন অথবা দু'দিনে কি সে মহান ব্রত উদ্‌যাপিত হল? সিংহবীর্য নরেন্দ্রনাথ কি অতি সহজেই আত্মনিবেদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে?...

সন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসরকালের বিচিত্র ইতিহাসের অন্তরালে তার বিশদ বিবরণ লুকিয়ে রয়েছে।...

ঠাকুর বলতেন, 'সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি!'

বলতেন—'একটা মাটির হাঁড়ি কিনতে গেলে লোকে তিনবার বাজিয়ে দেখে—আর যাকে ইহ-পরকালের জন্য জীবনের পথপ্রদর্শক বলে, গুরু বলে গ্রহণ করবে তাকে সে দেখে নেবে না? পরীক্ষা করে নেবে না? অবশ্য নেবে!'

সুতরাং নরেন্দ্রনাথ, সত্যপিপাসু নরেন্দ্রনাথ...যতই তাঁর অনুভূতি-সমূহকে, অতীন্দ্রিয় দর্শনগুলিকে যাচাই করে, পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, যতই তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য-জীবনটিকে সর্বভাবে বুঝে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন—ঠাকুর ততই তাঁর মধ্যে বিপুল ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়ে, তাঁর অকপট সত্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে প্রীতি লাভ করেছেন, উৎফুল্ল হয়েছেন। এবং নরেন্দ্রনাথের সকল পরীক্ষায় সহজানন্দে নিজকে ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত তাঁকে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

গুরু-শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ এইভাবে ধীরে ধীরে দীর্ঘ ছয় বৎসরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহজে নয়, দু'চার দিনে নয়।

এর পর অতি অল্পকালের ব্যবধান।

কাশীপুরের এক উদ্যান-বাটীতে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট—মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ গভীরতায়—সমাধিযোগে দেহত্যাগ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

যুগ-প্রয়োজন সাধন করবার গুরু-দায়িত্ব ও নিভৃত-কৌশলটি নরেন্দ্র-নাথকে দান ক'রে লীলাসম্বরণ করলেন যুগমানব।...

আর নরেন্দ্রনাথ কতিপয় গুরুভাইকে নিয়ে বরাহনগরের নিভৃত অংশে, একটি জীর্ণ ভূতের বাড়ীতে প্রথম মঠ স্থাপন করলেন এবং যে মহান্ গুরু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

কর্মভার তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছিল তার যথাযথ উদ্‌যাপনের জন্য গুরুভাইদের নিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন সেই জীর্ণ ভূতের বাড়ীটিতে।

ধ্যানে-উপাসনায়, পাঠে-আলোচনায় অর্ধাহারে-অনাহারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কোথা দিয়ে যেতে থাকল তার হুঁশ রইল না। তপস্যার যজ্ঞাগ্নি জ্বলতে লাগল অনির্বাণ, কীর্তনের উচ্চ-নিনাদ, মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাব—ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকল দিকে দিকে। অবিশ্রাম শাস্ত্রালোচনায় সরগরম হ'ল মঠবাটী।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই আদর্শে কৃত-সংকল্প তরুণ যোগীর দল নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধ করি নবযুগ-রচনার দুশ্চর ব্রত উদ্‌যাপনে একেবারে মগ্ন হয়ে গেল।

একদিন, দুদিন নয়—একবৎসর, দুবৎসরও নয়।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একাদশ বৎসর কাল—অব্যাহত চলেছিল সে বিরাট সাধনযজ্ঞ....প্রথমে ১৮৯২ খৃস্টাব্দ অবধি বরাহনগরে, তারপর আর একটি ভাড়াটে বাড়ীতে আলমবাজারে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্য এ দীর্ঘ সময় এক স্থানে বসে থাকা সম্ভব হয় নি।

তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত সন্ন্যাস-সংস্কার অল্পদিন মধ্যেই আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল নরেন্দ্রনাথকে—নিঃসঙ্গ, অনিশ্চিত জীবনের পরম ঈশ্বর-নির্ভরতার দিকে। ফলে, বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠার দু'-বৎসর কাল পরেই ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে পরিব্রাজক বেশে, রিক্তহস্তে—নিরালম্ব সন্ন্যাসী হয়ে একদিন অকস্মাৎ তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত ভূখণ্ডের অন্তহীন পায়ে চলার পথে।

* * * *

হিমশীতল হিমগিরির গুহায় গুহায়, মরুভূমির কঠিন-কঠোর ঊষরতায়, পুণ্যশ্লোক মনস্বিগণের পদরেণু-পূত তীর্থে তীর্থে এরপর কেটেছিল তাঁর দিন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-মণ্ডিত, তপস্যাসমৃদ্ধ পাঁচবৎসর কাল সময়।

বদরিকাশ্রমের দুর্গম তীর্থ থেকে রামেশ্বর, বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত থেকে দ্বারকা,—পায়ে হেঁটে হেঁটে অতিক্রম করলেন তিনি।

রাজার প্রাসাদ থেকে দীনের পর্ণকুটীর, ভিক্ষুকের শেষ-আশ্রয় বৃক্ষতল

বা পথপ্রান্ত থেকে সাধুর কুঠিয়া বা পর্বতগুহা সর্বত্র বাস করলেন তিনি।

বিশাল ভারতের বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে কত না জাতি, কত না ধর্ম, কত না ভাষা পাশাপাশি বাস করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

কি তাদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়? কি তাদের সাধনা ও আধ্যাত্মিক স্বরূপ? কোন্ মহান পরিণতির দিকে এগিয়ে চলবার অমরমন্ত্র আবিষ্কার করেছে ভারতবর্ষ তার সহস্র সহস্র বৎসরের অক্লান্ত সাধনা ও তপস্যায়?

আবার, কোন্ মহাপাপে আর্যবংশধর ভারত-ভারতী দারিদ্র্যের, কুসংস্কারের ও অজ্ঞানের গভীর পঙ্কেই বা নিমজ্জিত হয়েছে আজ?

এইসব জানবার জন্য, বুঝবার জন্য. .

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের নিগূঢ় মর্মকথা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করবার জন্য,...

এবং পুণ্য জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণার স্পর্শলাভে ধন্য হবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষায়, সমগ্র দেশ, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পরিভ্রমণ করলেন বিবেকানন্দ।...

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নিগূঢ় রহস্য অধিগত করলেন তপস্যায়, শাস্ত্রের দুর্ভেদ্য জটিলতা ছিন্ন করলেন পাঠে আলোচনায় ও গভীর মনন-শীলতায়।

সর্বোপরি, প্রকৃত ভারতবর্ষ—যে-ভারতবর্ষ দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, গ্রামাঞ্চলের নিভৃত নিরালায় সর্বভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে, তাকে চিনলেন প্রত্যক্ষ সংযোগে।

উপলব্ধি করলেন কোথায় তার মর্মবেদনা, কোথায় তার জীবনপ্রবাহের যথার্থ উৎসমুখ।...

এইরূপে, একইভাবে কাটল দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বৎসর কাল।

কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনায়, কত বিচিত্র মনোমুগ্ধকর কাহিনীতে, কত দুঃখ-ক্লেশের মর্মান্তিক সংঘাতে, আবার কত রাজোচিত সম্মানের উজ্জ্বলতায় সমৃদ্ধ যে ছিল তাঁর এই কালের পরিব্রাজক-জীবনের দিনগুলো ক্ষুদ্র-পরিসর বর্তমান আখ্যায়িকায় তার বিশদ পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়।

[illegible] [illegible] সীমাহীন আকাশ-পাত্রে ছন্দ রচনার দুরাশাও আমরা

পোষণ করি না। শুধু দুএকটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করি।

একটি ঘটনা কাশীধামের, তখন স্বামীজি কাশীতে।

সেই সময় একদিন কাশীর উপকণ্ঠস্থ নির্জন এক রাজপথে অকস্মাৎ তিনি কতিপয় বিশালাকৃতি বাঁদর কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। কাশীর বাঁদর নানাভাবে মানুষের উপর উপদ্রব করে থাকে জেনেই কতকটা শঙ্কিত মনে স্বামীজি দ্রুত-পলায়নে তৎপর হয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু তিনি যতই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন জন্তুগুলিও ততই তাঁর দিকে বেগে অগ্রসর হচ্ছিল।

অবশেষে যখন সেগুলি তাঁকে প্রায় ধরে ধরে, তখন অকস্মাৎ পিছন থেকে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল,—

'ফিরে দাঁড়াও, সোজা ঘুরে দাঁড়াও—পালিয়ো না।'

মুহূর্তে দৃপ্ত-ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলিও ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল।

পরবর্তী কালে, নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই ছোট ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সেদিন সেই সামান্য ঘটনাটি থেকে আমি এই শিক্ষালাভ করেছিলাম যে, বিপদের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সকল দুর্বলতার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে থাকতে হবে, তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বলেছিলেন, 'Face nature. Face ignorance. Face illusion! Never Fly.'..

এই কালের তাঁর জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—গাজীপুরের প্রসিদ্ধ মৌনীসাধু পওহারিবাবার সহিত সাক্ষাৎকার।

কেমন করে পওহারিবাবার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর নিকট দীক্ষালাভের জন্য স্বামীজি উন্মুখ হয়েছিলেন এবং কেমন করেইবা শ্রীরামকৃষ্ণের অশরীরী মূর্তি অশেষ অনুনয়ে তাঁকে দীক্ষা-সংকল্প থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, তদীয় বিস্তৃত জীবনেতিহাসে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

একদিন, দু'দিন নয়, ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ একুশ দিন দর্শন দিয়ে

[illegible]কৃষ্ণদেব সেবার তাঁকে দীক্ষা-গ্রহণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বামীজির রাজপুতনা পরিভ্রমণকালের একটি ঘটনাও এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি।...

স্বামীজি তখন ক্ষেত্রীতে। ক্ষেত্রীর মহারাজ অজিতসিং ইতিপূর্বে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর আশীর্বাদে অপুত্রক তিনি, সদ্য একটি পুত্র লাভ করেছেন। ফলে, পুত্রের জন্মোপলক্ষে অনুষ্ঠিত-উৎসবে ভক্তিমান মহারাজা ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজিকে ক্ষেত্রীতে আনয়ন করেছেন।

উৎসবে নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিপুল আয়োজন। আলোক-সজ্জার বিচিত্রসাজে সুসজ্জিতা নগরী!

সেদিন, নৃত্য-গীতের এক বিশেষ সভায় স্বামীজি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যই বোধ করি এক বিখ্যাত নর্তকী নৃত্য ও গীত শুরু করেছিল। রাজার পার্শ্বে এক রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন স্বামীজি।

বাইজী নৃত্য শুরু করতেই মুহূর্তে স্বামীজি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী তিনি, বাইজীর নৃত্য-গীতে যোগদান তাঁর ধর্ম নয়।

স-পারিষদ অজিতসিং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্বামীজি ধীর পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হলেন দরজার দিকে। অকস্মাৎ পশ্চাৎ থেকে নর্তকীর আর্তকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী স্বর তাঁর কর্ণে এসে আঘাত করল।...গান গাইছে ব্যথাতুরা নর্তকী তাঁকেই লক্ষ্য করে —

প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো,
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা ন'হী হোয়,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।

এক নদী এক নহর বহুত মিলি নীর ভরো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো।
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহতো সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞান সে ভেদ হৈ জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

মুহূর্তে ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীজির ব্রহ্ম-চেতনা যেন জাগ্রত হল—যেমন হয়েছিল বহু শতাব্দী পূর্বে একদা বেদান্ত-কেশরী আচার্য শঙ্করের—কাশীর রাজ-পথে নীচবংশোদ্ভব এক ভাঙ্গীর মুখে তত্ত্বজ্ঞানের পরম বাণী শুনে,...'একই সূর্য গঙ্গাজলে মদের বোতলে।'

ফিরে এলেন স্বামীজি সভাগৃহে। চোখে তখন তাঁর জল এসেছে। অকুণ্ঠ আশীর্বাদে ধন্য করলেন সে নর্তকীর অভিশপ্ত জীবন। তাঁর বেদান্ত-জ্ঞান এবং সর্বজীবে অভেদ বুদ্ধিও পরীক্ষিত হ'ল বাস্তবের কষ্টিপাথরে।

এমনি আরও কত অসংখ্য—গল্পের মত রোমাঞ্চকর ঘটনাই না এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় সেটা সম্ভব নয়। উৎসুক তরুণ পাঠক তাঁর বিস্তৃত জীবনী পাঠ করলে তাদের সম্যক পরিচয় পেতে পারবে।

ফল কথা, এমনি করে বহু বিচিত্র ঘটনা, অভিনব অভিজ্ঞতা ও কঠোরতম সাধন-তপস্যার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনেব সুদীর্ঘ দিনগুলি।

তাবপব একদিন, সমগ্র ভারত-পরিক্রমা শেষ করে যদৃচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ভারতের শেষ-তীর্থ কন্যাকুমারীতে উপনীত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

সেখানে, ভারতের শেষ উপলখণ্ডটির উপর বসে পুরঃ-প্রসারিত সুবিস্তৃত ভারত-ভূখণ্ডের দিকে চোখ তুলে তাকালেন একবার সেই প্রেমিক সন্ন্যাসী।

কত বিচিত্র ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হল তাঁর বিশাল হৃদয় সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে।

যে-প্রাচীন মৌনী ভস্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষ একদা সাধনা ও তপস্যার বলে যুগপৎ ভেদ করেছিল জন্মমৃত্যুর রহস্য, সৃষ্টি করেছিল বেদ, উপনিষদ, গীতা,...যে-দেশের সাধককুল জ্ঞানের চরম শিখরে উঠে একদিন নালন্দা

[illegible]লা, বিক্রমশীলা-ওদন্তপুরীর মত জগদ্বিখ্যাত মহাবিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল,...

প্রাচুর্যে, আনন্দে ও সৃষ্টি-কৌশলে একদা যে-দেশ জগতের শীর্ষ-স্থানীয় ছিল, আজ দুঃখে দারিদ্র্যে কুসংস্কারে ও অজ্ঞানে—অধোগতির কোন্ অতল গহ্বরে নেমেছে সে?

চোখ ফেটে তপ্ত অশ্রু নির্গত হ'ল তাঁর। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভিতরের সিংহ যেন গর্জন করে উঠল। কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য, মাতৃভূমির কলঙ্ক স্খালনে জীবনপাত করবার জন্য অন্তর তাঁর জাগ্রত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই দেখলেন, দূর সমুদ্রের নিঃসীম জলরাশির উপর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া-মূর্তি এগিয়ে চলেছে—দূরতর, গভীরতর সমুদ্রের দিকে। ইঙ্গিতে আহ্বান করে সে ছায়া-মূর্তি বলছেন যেন তাঁকে—দূর দিক্‌চক্রবাল পেরিয়ে, সপ্তসমুদ্রের বেলা অতিক্রম করে নূতন পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে যা তুই। ভারতবর্ষের মহিমা ও সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তা ঘোষণা কর সেখানে। ভারতবর্ষের সর্বযুগের ঋষিকুল আশীর্বাদ করবেন, শক্তি দেবেন তোকে। মাভৈঃ।

সঙ্কল্প স্থির হতে বিলম্ব হল না। দূরে বিলীনপ্রায় মহান গুরুর অশরীরী মূর্তির পানে তাকিয়ে আপন মনেই বললেন বিবেকানন্দ—হ্যাঁ প্রভু, আমি যাব। দূর অব্ধিপারে স্বাধীন দেশেই যাব। আমাদের অনবদ্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, বেদান্তের সার্বভৌম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ক'রে আমার হৃতসর্বস্ব মাতৃভূমির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করব। সেখান থেকে বিনিময়ে আনব অর্থ, আনব বৈজ্ঞানিক কৌশল, আনব সংগঠনশক্তি। আমার দুঃখিনী জন্মভূমির চোখের জল মোছাব আমি। তুমি আমার সহায় হও, আমাকে আশীর্বাদ কর।

[দ্বিতীয় পর্যায়]

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে। ভারতের বুকে, কালের রথে খরো় উড্ডীন ক'রে সমাগত সেই বিশেষ বৎসরের বিশেষ দিনটি।

বোম্বাই উপকূল থেকে আমেরিকার অজ্ঞাত তটভূমির উদ্দেশে সেইদিন যাত্রা করল জাহাজ—'পেনিন্সুলার' জাহাজ।

সে জাহাজের অন্যতম যাত্রী একক সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ।

অপরিচিত নূতন মহাদেশ আমেরিকা! সেখানে, শিকাগো শহরে, আহূত হয়েছে বিশ্ব-ধর্ম-মহাসম্মেলন। কিন্তু সে সম্মেলনে হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হন নি।...

তথাপি সেখানেই, তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনস্বিগণের সেই সম্মেলনেই, সভ্যজগতের, নূতন ও পুরাতন যাবতীয় ধর্মের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মুখেই, ভারতবর্ষের উদার সার্বভৌম ধর্ম ও জীবনদর্শন উপস্থাপিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন স্বামীজি।

সহায়হীন, সম্বলহীন, রাষ্ট্র ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতাহীন, একান্ত নিঃসঙ্গ ও একক তিনি; নির্ভর করলেন শুধু ভগাবনের আশীর্বাদের উপর, নির্ভর করলেন শুধু নিজ সংকল্পের দৃঢ়তার উপর, নির্ভর করলেন শুধু সেই শাশ্বত দেববাণীর উপর—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

বৌদ্ধযুগের পর, কত দীর্ঘ শতাব্দীর অন্তে ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ থেকে সেই প্রথম যাত্রা করল ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত, ভারতের কাল্-চারেল এম্বেসেডার—বহির্ভারতের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষের কেউ জানল না, বাংলার কেউ জানল না, এমন কি তাঁর প্রিয় গুরুভাইরাও কেউ জানলেন না সে সংবাদ। কেবল মাদ্রাজের কয়েকটি গুণমুগ্ধ উৎসাহী যুবক তাঁকে সামান্য অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিল, কেবল ক্ষেত্রীর রাজকর্মচারী মুন্সি জগমোহন টিকিট করে তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে গেল।

যাত্রা করলেন স্বামীজি।

বোম্বাই বন্দর ছেড়ে ধীরে ধীরে জাহাজ দূর দিক্‌চক্রবলয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হতে থাকল,...বিলীয়মান হতে থাকল ভারতবর্ষের শ্যাম-সুন্দর তট-রেখা। বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র ভেদ ক'রে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে শুরু হল চরম দুঃসাহসের অনিশ্চিত অভিযান স্বামীজির।

বোম্বাই থেকে কলম্বো, তারপর পেনাঙ্‌।

পেনাঙ্‌ থেকে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে আবার চীনের উপকূল ছুঁয়ে ক্যান্টন হয়ে জাহাজ পৌঁছাল জাপানের বন্দরে, নাগাসাকিতে।

জীবনে প্রথম স্বাধীন দেশে পদার্পণ করলেন বিবেকানন্দ।

তীব্র ঔৎসুক্য ও কৌতূহল নিয়ে নবজাগ্রত জাপানের ওসাকা, কিয়োটা, টোকিও প্রভৃতি বিখ্যাত শহর দেখলেন তিনি।

কর্মব্যস্ত সুস্থদেহ প্রগতিশীল তরুণ জাপান, আর তার ছবির মত সাজান পরিচ্ছন্ন শহরগুলি স্বামীজিকে মুগ্ধ করল, তাঁর দৃষ্টি খুলে দিল।

কিন্তু চকিতে কল্পনার ক্ষেত্রে ভেসে উঠল দূরদিগন্তের আর একটি ছবি, ভারতবর্ষের ছবি। দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, রোগ ও শিক্ষাহীনতায় একান্ত মলিন—দেশমাতৃকার সকরুণ সে ছবি! অব্যক্ত বেদনা জাগ্রত হল তাঁর অন্তরে।

লজ্জায় ক্ষোভে ও ধিক্কারে একান্ত অধীর হয়ে এই সময় তাই অনেক-গুলি দীর্ঘ চিঠি তিনি প্রেরণ করেছিলেন ভারতের তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করে জাপান থেকে।

তাঁর 'পত্রাবলী'-গ্রন্থে প্রকাশিত সে-সব অবিনশ্বর, উদ্দীপনাময় চিঠি ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে অক্ষয় হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে, অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পূর্বে-উচ্চারিত সে-সকল তেজোগর্ভবাণী দূর-প্রাচ্যের সূর্যরশ্মিরাঙা পর্বতগাত্রে প্রতিহত হয়ে আজও যেন ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছে। আজও তার প্রাণদ ঝঙ্কার কান পেতে যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি।

'বলি চান দেশমাতৃকা,...সহস্র নিঃস্বার্থ, তেজস্বী যুবকের জীবন বলি

চল। হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ...এগিয়ে এস, বেরিয়ে এস। Onward, Forward....

'কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে'...অনড় জড়তার মোহপাশ বিধ্বস্ত করে, বিচূর্ণ করে, 'পিঞ্জরাদিব কেশরী' মুক্ত আকাশের বিশুদ্ধ বায়ুতে ছুটে চলে এস।

'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—বিপুলা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ কর্মশালার দিকে। বুঝে দেখ,—শুদ্ধমাত্র অপরিসীম উদ্যমে, সঙ্ঘশক্তিতে আর বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্ষুদ্র জাপান, সদ্য জাগ্রত তরুণ জাপান...কেমন জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিপুঞ্জের মধ্যে নিজের মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে অতি অল্প সময় মধ্যে।

'এসে নিজ চক্ষে দেখে যাও এসব,—আর ধিক্কার দাও, সহস্র ধিক্কার দাও নিজেদের চরম অক্ষমতাকে,..ধিক্কার দাও নিজেদের কূপমণ্ডুতাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, পার যদি—বেশ ভাল করে' এ-কথাটি উপলব্ধি করে' যাও যে,—নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।'...

জাহাজ কয়েকদিন মাত্র রইল জাপানে।

তারপর জাপানের বন্দর ছেড়ে, প্রাচীন গোলার্ধের তটভূমি ছেড়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলল নূতন গোলার্ধের দিকে—ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাংকুবরের দিকে।

ভ্যাংকুবর! বৃটিশ কলম্বিয়ার বেলা-বন্দর ভ্যাংকুবর!

প্রায় একমাস কালে সমুদ্রের বহুযোজন পথ অতিক্রম করে' জাহাজ ধীরে ধীরে গিয়ে নোঙ্গর গাড়ল সেই বন্দরে।

সেখান থেকে ক্যানাডা হয়ে তিনদিন অবিশ্রাম রেলগাড়ীতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে—বহু নগর, জনপদ পার হয়ে—ভারতবর্ষ ছাড়বার প্রায় দুইমাস পরে পৌঁছালেন বিবেকানন্দ তাঁর বহু আশা ও কল্পনার ভাবী কর্মস্থান শিকাগো মহানগরীতে,—১৮৯৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রায় মধ্যভাগে।

শিকাগো! অগণ্য আকাশ-স্পর্শী বিচিত্র হর্ম্যমালায় সুসজ্জিত ঐশ্বর্য-ময়ী নগরী শিকাগো! বর্ণে ও বৈচিত্র্যে—জীবনচাঞ্চল্যের সজীবতায় নিত্য মুখরিত শিকাগো!

ঋজু ও প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম রাজপথের পাশে পাশে আলোকোজ্জ্বল বিপণি, আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত মুক্ত উদ্যান বাটীতে শোভাময়ী শিকাগো!

সংসারানভিজ্ঞ, বালকস্বভাব স্বামীজি বিস্মিত হলেন, বিহ্বল হলেন।

অদূর ভবিষ্যতে ঐ শহরের বুকে তাঁর জীবনের যে বিচিত্র অধ্যায় সূচিত হবে, শিকাগোর নামের সঙ্গে তাঁর নিজ জীবন কাহিনী যে-চিরন্তন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হবে, তা তখনো তাঁর কাছে একেবারে অজ্ঞাত হয়ে আছে। অনাগত ভবিষ্যতের নীরন্ধ্র গভীরে এককালে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে সে অপূর্ব আখ্যায়িকা।

* * * *

শিকাগোতে পৌঁছে নূতন অপরিচিত স্থানে কোনপ্রকারে একটা অতি সাধারণ হোটেলে ব্যবস্থা করলেন স্বামীজি বাসের ও আহারের। তারপর দু'একদিন মধ্যেই ধর্মমহাসভার সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু সংবাদ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন আরও কয়েক মাস পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে শুরু হবে মহাসভার অধিবেশন। আরও জানলেন, কোন বিশেষ রাষ্ট্রের বা ধর্মের যথাবিহিত ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কাউকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করবার নিয়ম নয় সেখানে। আবার, প্রতিনিধির নাম প্রেরণের শেষ তারিখও বহুদিন অতীত হয়েছে, সুতরাং আর কোন আশা নেই।

একটা দুরতিক্রম্য বাধা নূতন করে যেন অকস্মাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল কার্য সিদ্ধির পথরোধ করে।

বিমর্ষ ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন যেন স্বামীজি।

দূর বিদেশে—এককালে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় তিনি—হাতের সামান্য অর্থও শিকাগোর বিপরীত ব্যয়বাহুল্যে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে, আমেরিকার দুর্জয় শীতের উপযোগী পোষাকপরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁর নেই—এদিকে তীব্র শীত এগিয়ে আসছে শনৈঃ শনৈঃ। অথচ, আরও দু'তিন মাস কাল সেখানে অপেক্ষা না করেও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

দুর্যোগের ঘনান্ধকার যেন গাঢ়তম হয়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে এল,-

আশার ঈষৎ আলোকরেখাও যেন নিঃশেষে মুছে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তথাপি ভাবলেন স্বামীজি—শেষ অবধি লড়াই করে দেখবেন তিনি, যে-কোন তৃণখণ্ড ধরে ভেসে চলবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন তিনি! মাদ্রাজের বন্ধুস্থানীয় ও শিষ্যস্থানীয়দের জানালেন নিজ সংকটময় অবস্থা। আর বজ্র-দৃঢ় সংকল্পে শুরু করলেন লড়াই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে, **Heart within and God over head.**

এইভাবে বিবিধ সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাটল কয়েকদিন। শিকাগো ছেড়ে কম খরচে থাকবার সুবিধার জন্য স্বামীজি গেলেন বস্টন শহরে।

তারপর দিনে দিনে, ধীরে ধীরে—বাধাবিপত্তির ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করে ভাগ্যদেবতার হস্তবিধৃত আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল হতে শুরু হ'ল। সর্বথা—দেবরক্ষিত স্বামীজির জীবন পরম সার্থকতার পথে, যুগ-প্রয়োজন সাধনরূপ মহান ব্রত উদ্‌যাপনের পথে এগিয়ে যাবার সন্ধান পেতে লাগল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক জে. এইচ্. রাইট্।

দৈব-নির্দেশে বস্টন শহরে অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হল স্বামীজির। সে আলাপ বিবিধ শাস্ত্রের গভীর আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করল ক্রমে।

অধ্যাপক রাইট বিস্মিত হলেন স্বামীজির জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখে, স্তম্ভিত হলেন তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বচ্ছতা দেখে। ফলে, সুপারিশ পত্রের অভাবে স্বামীজি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হতে পারছেন না জেনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎসংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে অকপট শ্রদ্ধায় রাইট্ সাহেব স্বামীজিকে বলেছিলেন—**'To ask you Swami, for your credentials is like asking the sun to state its right to shine.'**

ধর্মমহাসভার প্রবেশপথ এইরূপে সুগম হতে শুরু হল।

কিন্তু কেবল রাইট্ সাহেবই নন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধি হিসাবে স্থান লাভ করবার পথে, হিন্দুধর্ম ও আর্য-

সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী নূতন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে উড্ডীন করবার পথে অন্যতম সহায়করূপে আরও একজন মনস্বিনী মহিলার নাম এস্থলে আমরা উল্লেখ করব। উল্লেখ করব শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

তিনি মিসেস জর্জ হেইল, শিকাগোর এক বিশিষ্ট ও অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলা মিসেস হেইল।

সেদিন আসন্ন শীতের প্রথম প্রভাতে ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন শিকাগোর আকাশ। নিজ প্রাসাদোপম বাসগৃহের গবাক্ষপথে লক্ষ্যহীনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস হেইল। অকস্মাৎ পথচারী স্বামীজির শ্রান্ত ও ক্লান্ত মূর্তি দেখে দৈবচালিত হয়েই যেন ছুটে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজিকে, 'আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমি ঠিকানা হারিয়েছি, পথও চিনি না' উত্তর করলেন স্বামীজি।

উত্তর শুনেই পরম সমাদর ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে আহার্য দিয়ে, বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে সুস্থ করলেন এক অপরিচিত বিদেশী কৃষ্ণকায় সন্ন্যাসীকে। শুধু তাই নয়, যথা সময়ে প্রভূতবিত্তশালিনী অভিজাতবংশীয়া সে মহিলা স্বয়ং স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে মহাসভার কার্যালয়ে প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর আহারের, বাসস্থানের সর্ববিধ ব্যবস্থা করে দিলেন।

যেমন অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত, তেমনি অভাবনীয় এসব ঘটনা। বিশ্বাস করতেও দ্বিধা হয় মনে। কিন্তু তথাপি এসব ইতিহাসেরই অভ্রান্ত অবিসংবাদী ঘটনা। দৈবযোগে এমনি ভাবেই সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বাস্তবক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল তারা বিগত শতাব্দীর শেষ-দশকে।

প্রতিনিধি হিসাবে স্থান লাভ করতে পেরে সর্বদিক দিয়েই বড় নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন স্বামীজি। ব্যয়নির্বাহের দিক দিয়েও তিনি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।

অধিবেশনের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। তাই, ধ্যানে প্রার্থনায়, উপাসনায় পাঠে ও গভীর চিন্তায় মধ্যবর্তী দিনগুলি অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে কাটাতে থাকলেন স্বামীজি।

অবশেষে ধীরে ধীরে সমাগত হল ধর্মমহাসভার সেই স্মরণীয় দিনটি—১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

সভারম্ভের বহুপূর্বেই বিরাট সভাগৃহের মধ্যে ঠেসা-ঠেসি, ঘেসা-ঘেসি হয়ে আসন নিল ইউরোপ-আমেরিকার সাত-আট হাজার বিখ্যাত বিশিষ্ট নরনারী। অর্থের গৌরবে শুধু বিখ্যাত নয়, পরন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কিংবা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদেরই একত্র সমাবেশে অভূতপূর্ব সে সম্মেলন।

সভাবেদীতে সমাসীন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের বিশিষ্ট প্রাচীন ও শাস্ত্রবিৎ প্রতিনিধিগণ। আর সভাপতির সম্মানিত আসনে খ্রীস্টান ধর্ম-যাজিগণের শীর্ষস্থানীয় কার্ডিনাল গিবন।

নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, নিজ নিজ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বথা প্রস্তুত হয়ে এসেছেন সবাই। আর তারই মধ্যে ত্রিশ বৎসরের যুবক বিবেকানন্দ।

হিন্দুভারতের প্রতিনিধি, সুপ্রাচীন আর্য-সভ্যতার অনিমন্ত্রিত প্রতিনিধি বিবেকানন্দ। জীবনে কখনো কোন সভায় যিনি বক্তৃতা করেন নি. বৃহৎ সম্মেলনকে মুগ্ধ করবার, প্রভাবিত করবার কোন কলা-কৌশল যাঁর অধিগত নয়, কোন প্রকারে পূর্বাহ্ণে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবার সাধারণ কথাটিও যাঁর মনে ওঠেনি।

এখন থেকে প্রায় ষাট বৎসর আগেকার কথা আমরা বলছি।

তখনকার ভারতবর্ষ বা আমেরিকা কোনটাই আজকের ভারতবর্ষ বা আমেরিকার মত ছিল না—কোন দিক দিয়েই।

সপ্ত-সমুদ্রের পরপারের ম্লেচ্ছদেশ আমেরিকা তখনকার ভারতীয় সমাজের কাছে একটা অজানা দুর্গম বিভীষিকার দেশ বলেই পরিচিত ছিল। ...সেখানে গেলে জাতও থাকে না, ধর্মও থাকে না—এই ছিল ব্যাপক বিশ্বাস। তার ফলে, শ্বেতকায়, ম্লেচ্ছজাতি-অধ্যুষিত সে সুদূর দেশে ক্বচিৎ কেউ তখন যাত্রা করত।

অন্য দিকে, পরাধীন অর্ধসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন কতিপয় কৃষ্ণকায় জাতির

'[illegible]' বলেই সে-দেশের কাছে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছিল

বর্তমান শতাব্দীর আকাশযানের যদৃচ্ছা ভ্রমণ-সুবিধার যুগে দাঁড়িয়ে রেডিও প্রভৃতি শতবিধ যান্ত্রিক প্রচার-ব্যবস্থার 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এ বাস করে প্রায় ষাট বৎসর আগেকার বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর সে-ছবিটি আজ আমরা মনে আনতে পারিনে।

মদগর্বিত শ্বেতজাতিগুলি কৃষ্ণকায় জাতিমাত্রকেই তখন কি অবজ্ঞা মিশ্রিত কৃপাদৃষ্টিতে দেখত তাও ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনে এবং তা পারিনে বলেই, যে দুর্দম সাহস নিয়ে, যে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও সুগভীর ভগবদ্বিশ্বাস নিয়ে একটি অখ্যাত, অজ্ঞাত ও নিঃসহায় পরাধীন দেশের ত্রিশ বৎসরের যুবক—সে বিশ্ব-ধর্ম-মহাসভায় তাঁর মাতৃভূমি ও ধর্মের গৌরব ও সভ্যতা, মাহাত্ম্য ও বিশালতা প্রচার করবার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তার তাৎপর্য এবং সংকটও সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনে।

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের ক্ষীণ কল্পনার! কিন্তু থাক সে কথা।

ঠিক পূর্বাহ্ণ দশটায় প্রার্থনা ও ঘণ্টাধ্বনির গম্ভীর আরাবের মধ্যে উদ্বোধন হ'ল সম্মেলনের। একে একে বিভিন্ন ধর্মের সুকৌশলী বক্তাগণ পূর্বপ্রস্তুতি অনুসারে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশে নিজ নিজ ধর্মের ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

তারপর, যথাসময়ে দাঁড়ালেন স্বামীজি।

বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে, প্রাচীন ভারতের সর্বযুগের ঋষিকুলকে স্মরণ করে, সর্বধর্মের সমন্বয়-প্রকাশ নিজ মহান গুরুকে স্মরণ করে গৈরিকমণ্ডিত অগ্নিময় পুরুষ হিন্দুধর্মের সার্বভৌম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন সে মহতী সভার সম্মুখে।

কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্ম নয় কোন বিশেষ দেশের নিজস্ব সম্পত্তিস্বরূপ কোন বিশেষ মতবাদও নয় পরন্তু, ভারতবর্ষের যুগ-যুগ তপস্যালব্ধ যে শাশ্বত, সমন্বয়ের বাণী—'একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি,'—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

সেই বাণীটিই ভারতের ভাগ্যবিধাতা, সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ-বিধায়ক-বিধাতা সঙ্কীর্ণতা-পীড়িত, সাম্প্রদায়িকতা-লাঞ্ছিত ধরিত্রীতে নূতন করে প্রচার করালেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে।

তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত উদার সে বেদমন্ত্র মুহূর্তে সভাগৃহে অভিনব স্পন্দন জাগ্রত করল। অশ্রুত-শ্রবণ সেই বিদ্বজ্জন রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে সে অভিনব সুর-সমন্বিত ঋক্‌গাথা শ্রবণ করল।...

রুচিনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেক গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব।

আবার শুনল,...

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম,
মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত সে মুহূর্তটি!

অখ্যাত, অপরিচিত বিবেকানন্দ—বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল সেই মুহূর্তটিতে। বহু যুগের লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত ভারতভূমি মর্যাদায় ও সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল সে ক্ষণটিতে।

আর সভামণ্ডপের সেই সপ্ত-সহস্র বিশিষ্ট নরনারী?

মুগ্ধ, বিস্মিত ও সম্মোহিত তারা—অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন উঠে দাঁড়াল। অধীর উল্লাসে ও অব্যক্ত আনন্দে যে বিপুল অভিনন্দন তখন তারা স্বামীজিকে জ্ঞাপন করল তাতে নিঃসংশয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশ ও কালের যাবতীয় সীমা লঙ্ঘন করে ধর্মের শাশ্বত অমৃতবাণী আবার মানব সভ্যতার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে।

* * * *

সমাপ্ত হল প্রথম দিনের অধিবেশন। একবাক্যে সমগ্র আমেরিকার

স্বামীজিকে সে অধিবেশনের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলে, নবযুগের আচার্য বলে স্বীকার করে নিল।

প্রথম দিনের পর আরও পাঁচটি বক্তৃা দিয়েছিলেন স্বামীজি সেই ধর্ম-মহাসম্মেলনে।

সর্বদেশের সর্বকালের নরনারীর জন্য রক্ষিত আছে সেগুলি 'শিকাগো বক্তৃতা' নামক তাঁর অমর গ্রন্থটিতে। তরুণ-সমাজ মুগ্ধ হবে, সবিশেষ উপকৃত হবে সে গ্রন্থের পাঠ ও অনুশীলনে।

সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের জীবনের সূত্রপাত হল এখন থেকে স্বামীজির। অবাধ ও মুক্ত জীবন, রমতাসাধু বিবেকানন্দ এখন থেকে সমগ্র বিশ্বের বিমুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টির পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

তখন থেকে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে হাজার হাজার নর-নারীর বিষম ভিড় জমতে লাগল তাঁর তিলেকের দর্শন লাভের জন্য। সাংবাদিকদের মধ্যে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তাঁব বাণী ও বক্তৃতা প্রকাশ করবার জন্য। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁকে অবিশ্রাম আমন্ত্রণ পাঠাতে লাগল বক্তৃতাব জন্য, ভাষণের জন্য। দলে দলে উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট নরনারী কখনো ব্যক্তিগত জটিল সমসা নিযে, কখনো তাঁর মতবাদ খণ্ডিত করবার মানসে, কখনো বা কোন বৃহত্তব প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগল।

কর্মের আবর্তের মধ্যে অক্লান্ত ও অবিশ্রাম ঘুরতে লাগলেন স্বামীজি।

শিকাগো নিউইযর্ক বস্টন ওযাশিংটন বাল্টিমোর ব্রুকলীন আইওযা—এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক কেন্দ্র থেকে অন্য এক কেন্দ্রে বেদান্তের বাণী বহন কবে, ভারতীয় সভ্যতাব অমৃতমন্ত্র ও শান্তিব বার্তা বহন করে ঝঞ্চার গতিতে তিনি ভ্রমণ কবতে লাগলেন। আমেরিকা বলল—সাইক্লোনিক্ হিন্দু।

সর্বত্র বিপুল জনসমাগম, সর্বত্র শিক্ষিত ও বিদ্বৎ সমাজের বিশিষ্ট নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, সাগ্রহে শুনতে লাগল তাঁর বাণী।

আবার অন্যদিকে, সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীল গোঁড়া-ধর্মধ্বজীর দল, ঈর্ষাকাতর পুরোহিত-সম্প্রদায়—স্বার্থহানির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে

সমালোচনাও শুরু করল ব্যাপকভাবে। তাঁকে বিপন্ন করবার জন্য, লোক-চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ঘৃণিত ষড়যন্ত্রও করতে লাগল তারা—শুধু ওদেশেই নয়, কতিপয় নীচমনা ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষেও। কিন্তু সর্বথা দেবরক্ষিত-জীবন বিবেকানন্দ, স্ফটিকশুভ্র দৃপ্তজীবন বিবেকানন্দ কখনো ভ্রুক্ষেপহীন উপেক্ষায় কখনো কঠিন প্রতিঘাতে স্তব্ধ করলেন নীচ আততায়ীদের।

বললেন, 'হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার,
সাধুলোক্‌কো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।'

বস্তুতঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজি, সিংহবীর্য পুরুষপ্রধান স্বামীজি—দৃপ্ত কেশরীরই মত চলতে থাকলেন—সত্যের আলো বিকীর্ণ করে, প্রেমের প্রবাহ সৃজন করে, মানবধর্মের যুগবার্তা প্রচার করে।

স্বার্থান্বেষীদের শত অপচেষ্টাসত্ত্বেও তাই নামযশের তাঁর অবধি রইল না। বিখ্যাত ধনকুবেররা, প্রথিতকীর্তি পণ্ডিতরা তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভের জন্য, তাঁকে অতিথিরূপে পেয়ে ধন্য হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে লাগল।

আর স্বামীজি?—

সর্বত্যাগী আজন্মবৈরাগী স্বামীজি—সে সুদুর্লভ স্বতঃউচ্ছ্বসিত সম্মান ও বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে, অর্থ ও প্রাচুর্যের সে আতিশয্যের মধ্যে কেবলই হাঁপিয়ে উঠতেন, জন্মভূমির অশেষবিধ দুঃখের কথা স্মরণ করে তীব্র বেদনায় কেবলই পীড়িত হতেন।

ধনীর প্রাসাদে দুগ্ধধবল শয্যায় শুয়ে রাত্রে তাঁর ঘুম আসত না। কত বিনিদ্র রজনীর প্রহরগুলি গৃহের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে অব্যক্ত বেদনার মধ্যে তাঁর অতিবাহিত হত।

দূর মাতৃভূমির দিকে মুখ করে করুণ প্রার্থনায় ভগবানকে ডাকতেন তিনি। বলতেন, 'কত আলো, কত ঐশ্বর্য এদেশে অকৃপণ-হস্তে তুমি দান করেছ প্রভু। ভারতেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার!

দূর কর সে তমিস্রা, জ্যোতির্ময় হে দেবতা!

ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ থেকে স্খালন কর অভিশাপকালিমা, মুছে দাও অজ্ঞানের কৃষ্ণমসী-লেখা—

জাগ্রত হোক, উদ্বুদ্ধ হোক, পরিশুদ্ধ হোক আমার জন্মভূমি, আমার স্বপ্নের সোনার ভারতবর্ষ!'

তাই দেখতে পাই সুদূর আমেরিকায় বসে, কর্মসমুদ্রের অবিশ্রাম তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে থেকেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হলেন এখন তিনি—কাজ শুরু করলেন ভারতবর্ষের জন্য। প্রথমে, দীর্ঘ পত্রাদির মধ্য দিয়ে অগ্নিময় বাণী ও বিস্তৃত কর্মনির্দেশ পাঠাতে লাগলেন বাংলায় গুরু-ভাইদের কাছে, আর মাদ্রাজে শিষ্যস্থানীয়দের কাছে।

আবার নানাদিক থেকে সংবাদপত্রাদির মধ্য দিয়েও তাঁর আমেরিকা অভিযানের চমকপ্রদ সব কাহিনী তখন ভারতে এসে পেঁছাতে লাগল।

ফলে, সত্যই সুপ্তোত্থিত হল ভারতবর্ষ। সচকিত হয়ে, বিস্ময়ে বাক্য-হারা হয়ে শুনল ভারত-ভারতী,...

কোন্ দূর অব্ধিপারের ধনকুবেরের দেশে, শত প্রতিকূলতার মধ্যে ভারতেরই এক অজ্ঞাত, অখ্যাত তরুণ সন্তান অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে আর্যসভ্যতার পরম বাণী, অমর আত্মার শাশ্বত বাণী—*Message of the Soul*—

'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়;
তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার
অন্যপথ নাহি।'...

Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings..

Ye divinities on earth—Sinners!

It is a sin to call a man so..

আবার, সেই সঙ্গে তাদের উদ্দেশ করেও উচ্চারণ করেছেন তিনি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সজীব মন্ত্র, প্রাণদমন্ত্র—

অগ্নির বুকে লাফিয়ে পড়,
কর্মপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়—
অটুট-সাহস কর্মিদল!
প্রভুর চরণে সঁপি দাও ঢেলে
জীবন সাধনা, কর্মফল।

একটা জীবন না হয় প্রভুর নামে প্রভুর কাযেই কেটে যাবে—নির্ভীক অন্তরে অগ্রসর হও, ব্রতী হও!

প্রার্থনা কর, দিনরাত প্রার্থনা কর—নিজের জন্য নয়, পদদলিত, উপেক্ষিত ভারতের কোটি কোটি নরনারীর জন্য—যারা যুগের পর যুগ কেবলই লাঞ্ছিত হয়েছে নিষ্পেষিত হয়েছে, তাদেরই জন্য।

অন্য কোন দেবতা নয়, অন্য কোন ভগবান নয়—নিরন্ন জনই জাগ্রত দেবতা, আর্তজনই জাগ্রত দেবতা—তাদেরই সেবায়, তাদেরই দুঃখমোচনে জীবনের সকল শক্তি নিয়োগ কর, সকল কাম্যফল উৎসর্গ কর, তবেই প্রসন্ন হবেন দেবতা, কৃতার্থা হবেন জননী, ধন্য হবে জীবন।

* * * *

অতীত হল প্রায় দুই বৎসর কাল —১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। সেটি এখানে বলা প্রয়োজন।

উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর বুকে সহস্রদ্বীপোদ্যান, Thousand Island Park, একটি ছোট দ্বীপ। সেই ছোট দ্বীপের একটি ছোট বাড়ীতে প্রায় দেড়মাস কাল গুটিকয়েক একান্ত অনুগত নরনারী সহ এইকালে বাস করেছিলেন স্বামীজি।...অকপট শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যাদের, তাদের হাতে হাতে, কার্যকরীভাবে যোগশিক্ষা দিবার জন্য, ধ্যানশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ করে সেই নির্জন স্থানে, নিসর্গের সেই একান্তনিস্তব্ধ নীরবতায়

কয়েকটি সপ্তাহ বাস করেছিলেন তিনি। সর্বদিক দিয়েই সেখানকার সেই স্বল্পকালের নিভৃত ধ্যান-জপের দিনগুলি, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিনগুলি স্বামীজির আমেরিকার জীবনে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় যোজনা করেছিল।

'দেববাণী' বা Inspired Talks নামক স্বামীজির বিখ্যাত গ্রন্থে সেই দিব্যজীবনের অনুপম কাহিনী লিপিবদ্ধ করে অমর হয়েছেন তাঁর অন্যতমা মার্কিন শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডু।

এইভাবে আমেরিকার মানসক্ষেত্রের অতি গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বামীজির মহতী প্রচেষ্টার অক্ষয় বীজ মহামহীরুহরূপে ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করতে শুরু করল।

বেদান্তের সার্বভৌম উদার বাণী সে-দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে যথাবিহিত ধ্যানাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করলেন ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও তপস্যালব্ধ অমৃততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেল নূতন গোলার্ধের বুকে—ঐশ্বর্যের অমরাবতী আমেরিকায়।...

এরপর কিঞ্চিদধিক একমাসের একটি ক্ষুদ্র বিরতি। আমেরিকা থেকে স্বামীজির প্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা। কতিপয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী পরিচিত ব্যক্তি সাগ্রহ-আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন সেখান থেকে।

কিন্তু স্থিতিস্থাপকধর্মী রক্ষণশীল ইংলন্ড, পৃথিবী-জোড়া রাজত্বের অধীশ্বর, মদগর্বিত ইংলন্ড,...তৎকালীন ভারতের সর্বময় অধিপতি ইংলন্ডে —কী ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে, কী মর্যাদা দেবে—সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় ও দ্বিধা জাগ্রত হয়েছিল তাঁর মনে। তথাপি সকল দিক চিন্তা করে, সকল পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে ইংলন্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। আর তদনুসারে যাত্রা করেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে, সেপ্টেম্বরে।

কিন্তু যুগে যুগে, কালে কালে যে-সত্য বহুধা পরীক্ষিত হয়েছে,

ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণিত হয়েছে—সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণকৃৎ স্বামীজির জীবনেও **সেই সত্যই পুনঃ প্রমাণিত** হল, প্রতিষ্ঠিত হল...

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ ।'

বস্তুতঃ, কোন মোহমন্ত্রে যেন রক্ষণশীলতার দুর্গদ্বার মুহূর্তে তাঁর সামনে খুলে গেল। ইংলন্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি অতি সত্বর তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করতে আরম্ভ করল। অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজের বহু বিশিষ্ট নরনারী প্রাচ্যের বাণী শুনবার জন্য, বেদান্তের বাণী শুনবার জন্য তাঁর চারদিকে এসে সমবেত হতে লাগল।

অতি অল্প সময় একমাস। কিন্তু তারই মধ্যে তত্রত্য প্রভাবশালী সমাজের একটা বিশিষ্ট অংশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেন তিনি। তারপর, একমাস অন্তে পুনর্বার শীঘ্র ইংলন্ডে ফিরবেন স্থির করে আবার যাত্রা করলেন আমেরিকায়।

* * * *

আমেরিকায় তখন সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছে। যে তত্ত্ব এতদিন বক্তৃতায়, ভাষণে ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়েছে, তাই এখন স্থায়ী সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে, কার্যকরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিফলিত করবার দুশ্চরব্রতে ব্রতী হয়েছেন আমেরিকার বহু বিশিষ্ট নরনারী।

রাজযোগ, ভক্তিযোগ, মদীয় আচার্যদেব প্রভৃতি স্বামীজির বিখ্যাত গ্রন্থাদি তখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। আর প্রকাশিত হয়েছে দেববাণী নামক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। সুতরাং, এখন প্রধানত সংগঠনের ও ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার কাজেই স্বামীজিকে বেশী মনোযোগ দিতে হ'ল আমেরিকায়। বক্তৃতাদির মধ্য দিয়ে প্রচারকার্যও যে না চলতে থাকল এমন নয়; তবু খাঁটি বৈদান্তিক গ'ড়ে তুলবার কাজেই প্রধানত তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এইকালে।

নিজ কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে এই সময় তাই তিনি বলেছিলেন—

'We have no organisation, nor want to build any.. Individuality is my motto. I have no ambition beyond

training individuals..I am a Sannyāsin. As such I hold myself a servant, not as a master in this world.'..

কিন্তু অতি অল্প সময়, মাত্র চার মাস মতো সময় এ যাত্রায় তাঁর থাকা হল আমেরিকায়। ইতিমধ্যে আবার জরুরী আহ্বান এল ইংলন্ড থেকে এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি যাত্রা করলেন সে দেশে।

ইংলন্ডে দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চাইতে অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। ম্যাক্সমুলার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাব ও প্রীতির আদান-প্রদান সাধিত হল।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বেদান্ত প্রচারের অতি অনুকূল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হলেন তিনি এবার।

আবার শুধু ইংলন্ডেই নয় ইউরোপের অন্যান্য কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্থানও এবার স্বামীজি পরিভ্রমণ করলেন।

সুইজারল্যান্ড, জার্মেনি, নেপল্‌স প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পদার্পণ করে তত্রত্য সুধীসমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বিগণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করলেন। পল ডয়সন, ফ্রেডারিকমায়ার্স, রেভারেণ্ড জনপেজ্ প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ ও পরিচয় ঘটল স্বামীজির।

এইরূপে নবযুগের ভারতীয় ঋষি প্রায় তিনবৎসরকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে—আমেরিকায়, ইংলন্ডে ও মধ্য-ইউরোপে—ভারতীয় সভ্যতার অমর বাণী, বৈদান্তিক ধর্মের উদার সার্বভৌম তত্ত্ব নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অনুভূতির জীবন্ত উদাহরণে প্রচার করে' ভারতবর্ষের লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন বহির্ভারতে। বৈজ্ঞানিক সভ্যতাগর্বিত বস্তুতান্ত্রিক শ্বেতজাতি-পুঞ্জের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন যথার্থ শান্তি, প্রীতি ও সাম্যের পথ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করলেন কর্মকুণ্ঠ ভারতবর্ষকে, দেশাত্মবোধে জাগ্রত করলেন পরাধীন জাতিকে এবং খাঁটি ভারতীয় আদর্শে, পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেশের

সাহিত্য ইতিহাস শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতি গড়ে তুলবার জন্য সচেতন করলেন পণ্ডিত-সমাজকে।

এমনি করে, একদা তিন বৎসর পূর্বে যে দুঃখিনী হৃতসর্বস্ব মাতৃভূমির অশ্রুমোচন করবার জন্য নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ—অখ্যাত অপরিচিত বিবেকানন্দ—একান্ত অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়েছিলেন বোম্বাই বন্দর থেকে, আজ দেবতার আশীর্বাদে আর স্বকীয় অনন্যসাধারণ দিব্য প্রতিভায় সেই দুরূহ ব্রত বহুলাংশে উদ্‌যাপিত করে কর্মক্লান্ত দেহে দেশে ফিরবার প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামীজি।

এই সময়, দেশমাতৃকা অন্তরে অন্তরে আহ্বান করল যেন তার বীর সন্তানকে, তার নবযুগস্রষ্টা আচার্যকে। আর সেই আহ্বান প্রাণের একান্ত গভীরে সুস্পষ্ট অনুভব করে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে ফিরবার সিদ্ধান্ত করলেন স্বামীজি।..

রুশ দেশে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে এই সময় জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন—অন্তরের নিভৃত নিরালায় আমার পুণ্য-জন্মভূমির আহ্বানধ্বনি আমি শুনতে পেয়েছি। রুশ দেশে যাবার প্রস্তাব এবারের মত মুলতবী রইল।..

তাই দেখি, সহসা একদিন—তখন তিনি নেপল্‌সে—তাঁর অন্যতম ইংরেজশিষ্যা মিসেস্ সেভিয়ারকে ডেকে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ-যাত্রার ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন। বললেন, 'চারখানা টিকিট কাটবে, চারটি বার্থ রিজার্ভ করবে।' বলা বাহুল্য, একটি তাঁর নিজের জন্য আর তিনটি তিনজন ইংরেজ শিষ্যের জন্য।

তার মধ্যে একজন তাঁর অতি বিশ্বস্ত সাঙ্কেতিক লেখক জে. জে. গুড্-উইন, আর দুইজন মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার—যাঁরা পরবর্তী কালে হিমালয়ে মায়াবতীতে প্রস্তুত করেছিলেন 'অদ্বৈত আশ্রম'।

ব্যবস্থা হতে বিশেষ বিলম্ব হল না।

ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইংলন্ডের কাজের যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত মনে—সাক্ষীর ভাবে—ভারতবর্ষ অভিমুখে পা বাড়ালেন মানবকল্যাণব্রত বিবেকানন্দ নেপলস্ বন্দর থেকে।

৩০শে ডিসেম্বর ছাড়ল তাঁর জাহাজ—Printz Regent Luitpold জাহাজ।

* * * *

ভারতবর্ষ!

তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের স্বপ্ন-উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী ভারতবর্ষ!

সেই ভারতবর্ষে ফিরে চলেছেন তিনি কতকাল পরে!

অন্তরে সহস্রবিধ কর্মপরিকল্পনার সুস্পষ্ট, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান নিয়ে, অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের পরিপূর্ণ অর্ঘ্যথালি সাজিয়ে উৎফুল্ল স্বামীজি জাহাজে ভেসে চললেন। বহুশ্রমের পর পূর্ণ বিশ্রাম ও প্রশান্ত আনন্দের সে দিনগুলি!

পথে পথে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মধ্যে মধ্যে চকিতে প্রকাশিত হচ্ছে অন্তরের সুগভীর দেশপ্রীতি...

'India I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me, the very air is now to me holy..it is now the holy land, the place of pilgrimage,..the Tirtha.'

—এ তাঁর এই সময়কার বহু উক্তির একটিমাত্র।

* * * *

এ-সময়কার জাহাজ-জীবনের ছোট দুটি ঘটনা এখানে বলি,—একটি ঘটনা স্বপ্নের অন্যটি বাস্তবের।

স্বপ্নটি দেখেছিলেন,—একদিন মধ্যরাত্রিতে ক্রীট দ্বীপের কাছ দিয়ে জাহাজ যাবার সময়ে। সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন তখন স্বামীজি। এরি মধ্যে দেখলেন এক শ্বেত-শ্মশ্রু-শোভিত দীর্ঘকায় পুরুষ ঠিক তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'ঐ ক্রীট দ্বীপ। একদা ঐস্থান থেকে উত্থিত হয়ে খ্রীস্টধর্ম জগতে প্রচারিত হয়েছিল। খোঁড়, খুঁড়লেই সন্ধান পাবে।'

স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বামীজির। কেবিন থেকে দ্রুত বেরিয়ে

এলেন তিনি। জাহাজের একজন কর্মচারীকে সম্মুখে দেখে প্রশ্ন করলেন,

— কত রাত্রি এখন?

— বারোটার কিছু বেশী।

—আমরা কোথা দিয়ে চলেছি এখন?

—ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইল দূর দিয়ে।...*Fifty miles off Crete.*

স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অদ্ভুত সঙ্গতিতে বিস্মিত হলেন স্বামীজি। স্বপ্নটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি জীবিত থাকতে অবশ্য কিছুই হয়নি, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর সত্যই ক্রীট দ্বীপের ভূগর্ভ খনিত হয়েছিল এবং খ্রীস্টধর্মসংক্রান্ত বিবিধ মূল্যবান উপাদান সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল।—

আর দ্বিতীয় ঘটনাটি বাস্তবের।

দু'জন ধর্মপ্রচারক ইংরেজ-খ্রীস্টান জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন স্বামীজির। জাহাজ নেপল্স ছাড়বার দু'চারদিন পরই স্বামীজির সঙ্গে তাঁদের আলাপ পরিচয়ও ঘটেছিল। আলাপের সূত্র ধরে একদিন হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলেন সেই পাদ্রীদ্বয় স্বামীজির সঙ্গে। কিন্তু তর্কযুক্তির সম্বল তাঁদের অতি অল্প সময়েই ফুরিয়ে গেল। তখন শুরু হল, যা সচরাচর হয়ে থাকে, হিন্দুধর্মকে অভদ্র গালাগালি, হিন্দুজাতিকে অভদ্র আক্রমণ।

জাহাজের ডেকের উপর পাশাপাশি হাঁটছেন তখন তিনজন, দু'জন দুপাশে, স্বামীজি মধ্যে।

কিছুক্ষণ ধৈর্যধরে, দু'একবার মৃদু প্রতিবাদ করে স্বামীজি শুনলেন সে-সব গর্বিত অপভাষণ—তারপর মুহূর্তে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন প্রধান নিন্দুকের কণ্ঠনালী।

সিংহগর্জনে বিশাল নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত করে বললেন, 'আর একটিবার তুমি আমার ধর্মকে গালাগালি দিয়েছ কি আমি তোমাকে দূর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি! সাবধান!'

'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'! সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল উদ্ধত ইংরেজ। ক্ষমা চাইল তক্ষুণি তাঁর কাছে, বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে নিল বিনীতভাবে।

এইঘটনাটির যৌক্তিকতা নিয়ে পরবর্তীকালে কোন বাঙালী ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজিকে একদিন।

স্বামীজি বলেছিলেন, 'আপনার জননীকে যদি কেউ আপনার সম্মুখে অন্যায় গালিগালাজ করে তবে আপনি কি করেন?'

'কেন, তাকে উচিতমত শিক্ষা দিয়ে দি।'

'তা হ'লে'—ধীরে ধীরে বলেছিলেন স্বামীজি—'যে-ব্যক্তি সমগ্রদেশের মাতৃরূপা ধর্মকে যথার্থ জননীবোধে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, সে তার নিন্দা শুনলে,—বিশেষত একজন উদ্ধত বিদেশীর কাছে—অন্যরূপ ব্যবহার কেমন করে করবে?'

আর কোন প্রত্যুত্তর করেননি ভদ্রমহোদয়।

বস্তুত, প্রেম ও তেজস্বিতা, করুণা ও তীক্ষ্ণ স্বাজাত্যাভিমান, জ্ঞান ও কর্মশক্তি, ধ্যান ও সংগঠনতৎপরতা, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম—সর্ব বিপরীত গুণাবলীর অদৃষ্টপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল এ ক্ষণজন্মা মনীষীর দেবদুর্লভ জীবনে।

'এমনটি হয় নি, হবে না'—তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই যে উক্তি, তা সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করেছিল তদীয় উত্তর জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে।...

৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ নেপল্‌স ছেড়েছিল, একথা পূর্বে বলেছি।

ষোল-সতের দিনে সে ভারতবর্ষের প্রান্তে এসে পৌঁছাল।

সেদিন ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

রাত্রির অন্ধকার অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঊষালোকে কলম্বো বন্দর দেখা গেল।

স্বামীজি জাহাজের 'ডেকে' দাঁড়িয়ে—'তমালতালিবনরাজীনীলা' কলম্বোর বেলাভূমির দিকে তাকিয়ে, দূর দিগন্তে অস্পষ্ট চক্ররেখায় বিলীন-প্রায় ভারতমাতার দিকে তাকিয়ে ভক্তিবিনম্র অন্তরে অকুণ্ঠিত প্রণতি জ্ঞাপন করলেন দেশমাতৃকাকে।

মনে মনে বললেন, আর্যসভ্যতার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি, বেদ-প্রসবিনী হে আমার স্বর্গাদপিগরীয়সী দেশমাতৃকা,—দীন সন্তানের ঐকান্তিক প্রণাম গ্রহণ কর।

তোমারই লুপ্তগৌরবে, লাঞ্ছিত মর্যাদায় ব্যথিত হয়ে, তোমার একান্ত সহায়হীন, অকিঞ্চন সন্তান আমি—একদা ভোগৈশ্বর্যের কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় যাত্রা করেছিলাম। তোমার মুক্তিপথের সন্ধান লাভের জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করেছি—আলস্য করিনি, বিশ্রাম করিনি।

সাফল্য কিছু অর্জন করেছি কিনা ভাবী কাল তা নিরূপণ করবে। কিন্তু শুধু ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্য, শুধু কুণ্ঠাহীন ও সাধ্যাতিরিক্ত শ্রমেরই জন্য—পরিপূর্ণ অন্তরে, শান্তচিত্তে তোমার ক্রোড়ে ফিরে আসতে আজ আমার কোন দ্বিধা নেই।

হে দেবলীলাস্থল, পুণ্য জন্মভূমি, আমার অকুণ্ঠ প্রণতি গ্রহণ কর।...

সমুদ্র-শীকর-স্পৃষ্ট ভারতের শুদ্ধ বায়ু বহু কাল পরে আবার তাঁর সর্বাঙ্গে আশীষস্পর্শ দান করল।

[তৃতীয় পর্যায়]

শিশিরসিক্ত প্রভাতের প্রথম প্রহর।

কলম্বো বন্দরে পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

উদয়-শিখরে নূতনসূর্যের প্রথম আবির্ভাবে নবযুগের উদ্বোধন হল ভারতবর্ষে।

কলম্বোর বেলাভূমে সূর্যকরোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশতলে সেদিন কী মহতী জনতা! ধর্মনির্বিশেষে, বিত্তনির্বিশেষে, উচ্চাবচনির্বিশেষে—সহস্র সহস্র নরনারীর কী বিপুল সমাবেশ!

ধীরে ধীরে প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হলেন জেটির দিকে....ধীরে ধীরে প্রচণ্ড আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পুষ্পে-মাল্যে, ধূপে-দীপে বন্দনা জ্ঞাপন করলেন তাঁরা স্বামীজিকে।

পুরনারীগণ উলুধ্বনি দিয়ে, শঙ্খধ্বনি দিয়ে,—লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করে অভিনন্দিত করল সে মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিকে।

স্বামীজি প্রীত হলেন, আনন্দিত হলেন।

নিজের গৌরব-গরিমার জন্য নয়, ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতির জন্য নয়। প্রতিষ্ঠা-কীর্তির চটুল মোহ তাঁর ত্যাগদীপ্ত বৈরাগী মনকে কোন দিন কোন কালে স্পর্শ করতে পারে নি। 'যজ্ঞাহুতি হোমশিখার' মত নিত্য ঊর্ধ্বমুখী তাঁর চিত্তবৃত্তিগুলি চিরদিন তুচ্ছ যশ-অপযশকে, নিন্দা-স্তুতিকে অতিক্রম করে অব্যাহত আনন্দলোকে স্বমহিমায় বিরাজ করেছে।

'আমার জীবনের বিস্তৃত কর্মপ্রবাহে ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি যথেষ্ট ঘটেছে—কিন্তু তার জন্য কোন গ্লানি, কোন অনুশোচনা কখনো আমার মনে উদিত হয় নি। কারণ, আমার অকিঞ্চিৎকর শক্তিতে এ-জীবনে ভালমন্দ যা-কিছু আমি করেছি তা সর্বথা পরার্থে করেছি, নিজের জন্য নয়। স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কোন কাজ আমার দ্বারা কখনো সাধিত হয় নি।'

তদীয় বিরাট জীবনের যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার, বহু বিপরীত

গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয়-সমৃদ্ধ তাঁর অলোকসামান্য চরিত্রের নিগূঢ় মর্মকথা উপলব্ধি করবার পক্ষে তাঁর নিজমুখের এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরই ইঙ্গিতানুসরণে একথা সহজে বোঝা যাবে যে, কলম্বোর বুকে পদার্পণ করে সকল ধর্মের, সকল বয়সের নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দ-প্রকাশ তাঁর জন্য, তাঁকে লক্ষ্য করে উদ্বেলিত হয়েছিল সেটি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সংস্কৃতির উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য মনে করেই তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন।

ভারতের জনগণ ধর্মের নামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, নিজ প্রাচীন ঐতিহ্যে গর্ব অনুভব করেছে, জড়তার গ্লানি কাটিয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনায় জাগতে শুরু করেছে—এই সম্ভাবনার আনন্দই তাঁকে উৎফুল্ল করেছিল সেদিন।

কলম্বোর বার্ণস স্ট্রীটে বিরাট জনসভায় মানপত্রের উত্তরেও তাই তিনি বলেছিলেন—

'অর্থহীন, আভিজাত্যহীন পথচারী এক সন্ন্যাসী আমি। সৈন্যবলে কোন সাম্রাজ্য জয় করে আসি নি, অর্থবলের যে বিশেষ গৌরব ও প্রতিপত্তি তাও আমার নেই। তথাপি যে বিপুল সম্মানে ও শ্রদ্ধায় কলম্বোর নরনারী আজ আমাকে অভিনন্দিত করেছে- সেটি তাদের অন্তর্নিহিত গভীর ধর্ম-ভাবের প্রেরণায়ই করেছে। তাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলেই একে আমি গ্রহণ করেছি, অন্য কোন ভাবে নয়।

একথা বুঝতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে যে ধর্মই ভারতের প্রাণ, ধর্মই ভারতের আদর্শ। ধর্মসাধনাই তার সর্বসাধনার নিয়ামক। যুগে যুগে সেই আদর্শকে পুরোভাগে স্থাপন করেই ভারতবর্ষ এগিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। আবার উত্তরকালেও যদি পৃথিবীর বুকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদায় তাকে বাঁচতে হয় তবে সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই, জীবন্ত করেই তাকে বাঁচতে হবে।'

শ্রদ্ধানতচিত্তে কলম্বো শ্রবণ করেছিল, গ্রহণ করেছিল সে দিব্যবাণী।

তারপর কলম্বো থেকে কাণ্ডী, কাণ্ডী থেকে অনুরাধাপুর হয়ে জাফ্না গিয়েছিলেন স্বামীজি। কিন্তু, যেখানেই যখন গিয়েছিলেন—সর্বত্র অভাবনীয় উৎসাহ-চঞ্চলতা, সর্বত্র বিপুল সম্মান ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে

অপেক্ষমান ছিল মহতী জনতা। আর তাদেরই ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন মূল ভারত-ভূখণ্ডের দিকে—মাদ্রাজের দিকে।

অবশেষে, ১৮৯৭ এর ২৬শে জানুয়ারী—ভারতবর্ষের পুণ্যমাটিতে, পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

২৬শে জানুয়ারী! উত্তরকালে ভারতবর্ষের মুক্তি-ইতিহাসে যে রক্ত-লিখায় চিহ্নিত হয়েছিল এই দিনটি, লক্ষ লক্ষ নরনারীর বন্দনায় ও শত শত শহীদের আত্মাহুতিতে যে অভিনব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল এই দিনটি—কে জানে, তারই আগমনী-ইঙ্গিত নিহিত ছিল কি না—নবযুগের জাগর-মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে ঐ বিশেষ দিনে স্বামীজির ভারতের কোলে প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে!

আমরা জানি না, কেউই হয়ত জানে না,—কিন্তু ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগ বস্তুতঃ অমনি ঘটেছিল!

২৬শে জানুয়ারীই পাম্বান থেকে মাদ্রাজে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন স্বামীজি।...

মাদ্রাজ!

যে মাদ্রাজ চারবৎসর পূর্বে একদা কীর্তিহীন, খ্যাতিহীন বিবেকা-নন্দকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে, আত্মিক সাধনার প্রতিভূরূপে শিকাগো শহরে প্রেরণ করবার কাজে অগ্রণী হয়েছিল,—যেখানকার যুবসমাজ সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল শুদ্ধ তাঁর শুভ্র চরিত্র দেখে, স্তম্ভিত হয়েছিল তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান-গভীরতা দেখে,..অভিভূত হয়েছিল তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের অমিত প্রভাব দেখে,—

আজ পাশ্চাত্ত্যবিজয়ের পর সেই মাদ্রাজে স্বামীজির প্রথম পদার্পণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

তাই দেখি, সমগ্র মাদ্রাজ যেন অধীর আনন্দে উল্লসিত হয়ে অপূর্ব অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে।...

সর্বত্র অবিশ্বাস্য জনসমাগম! পথে পথে, গৃহচূড়ায়, গবাক্ষে অলিন্দে—সর্বস্থানে অগণ্য নরনারীর সে কি অভূতপূর্ব সমাবেশ। ফাঁক নেই, তিল-

ধারণের স্থান পর্যন্ত নেই। সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসীকে একটিবার শুধু দর্শন করবার জন্য সে কী অসম্ভব চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা! বহুশতাব্দীর অন্তে ভারতের মাটিতে সে এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা!

তারপর যথাসময়ে বিরাট জনসভার আয়োজন ক'রে ভিক্টোরিয়া হলে সমগ্র মাদ্রাজবাসীর পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হল তাঁকে।

উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম সেই ঘোষণা করলেন তিনি তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সমরনীতি—'*My plan of Campaign.*'

মানুষ চাই,—খাঁটি, অকপট মানুষ! আশিষ্ঠ যারা, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ যারা, অবিচল শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত যারা—এমন মানুষ। তাদেরই প্রতি প্রথম তাঁর উদাত্ত আহ্বান!

যদি এমন একশত খাঁটি যুবক এগিয়ে আসে ..সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসে.. তবেই জাগবে ভারতবর্ষ। দুঃখের তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে আলোক-রশ্মি তবেই প্রতিফলিত হবে তার আকাশে ও আঙিনায়।

ধর্মের দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি। যুগে যুগে অধ্যাত্মসত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পুষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন। সেই ধর্মকে পুনর্বার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

The country must be flooded with religion and spirituality.

জ্ঞান দাও, শিক্ষা দাও, রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দাও। শিক্ষার আলোক-ধারায়ই দেশের পুঞ্জীভূত গ্লানি বিদূরিত হবে।

Education is the panacea of all evils.

উপনিষদের প্রাণদমন্ত্রে দীক্ষিত কর উদ্বুদ্ধ কর ভীত আর্ত অনড় জাতিকে।

The shining, strengthening, the bright philosophy of Upanishads.

তাকে গ্রহণ কর, অনুসরণ কর।...

ভারতের উত্থান অবশ্যম্ভাবী।

'দেশপ্রেম? হে দেশকর্মিগণ, হে সংস্কারকগণ!...কাকে বল দেশপ্রেম? ...কী তোমার patriotism?'

I have my own ideas of patriotism.

দেশের জন্য যথার্থই কি তুমি অনুভব কর? তীক্ষ্ণভাবে, তীব্রভাবে? গভীর অথই জলের নীচে সবলে চেপে ধরলে বদ্ধ-নিঃশ্বাস কোন মানুষের যে মর্মান্তিক অবস্থা ঘটে...দেশের বহুযুগ-সঞ্চিত দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে তেমনি অবস্থা কি তোমার ঘটেছে?—তেমনি বেদনায় মুমূর্ষু? মৃত্যুযন্ত্রণায় তেমনি একান্ত অধীর? তা যদি হয়ে থাকে তবে দেশ-সেবার প্রথম ধাপে তুমি পা দিয়েছ মাত্র।

এরপর, সেই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বজ্রদৃঢ় নিষ্ঠায় বাধাবিঘ্নের পাষাণপ্রাকার ধূলিসাৎ করে অদম্যসাহসে এগিয়ে যাবার জন্য কি তুমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? যদি হয়ে থাক, তবে দ্বিতীয় ধাপে তোমার পা দেওয়া হয়েছে।

তারও উপর আবার...একটি সুচিন্তিত, পূর্বাপর সুপরিকল্পিত কর্ম-পন্থা কি আবিষ্কার করেছ তুমি? যদি এই তিনটির যুগপৎ সমাবেশ তোমার জীবনে ও চরিত্রে ঘটে থাকে—তবেই সার্থক হবে তোমার দেশপ্রেম, ফলপ্রসূ হবে তোমার পেট্রিয়টিজম্। নতুবা, ফাঁকা কথা আর সংবাদপত্র মারফৎ নিজের ঢক্কানিনাদ!—দুর্ভাগা ভারতবর্ষে সে নাটকীয় প্রহসন যথেষ্ট হয়েছে, এবার সেটি বন্ধ কর।

* * * *

হায়! আমাদের জাতীয় খেয়াতরীটি আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে লক্ষ কোটি নরনারীকে জীবনজলধি পার করিয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, রৌদ্র-বৃষ্টি-কড়কাপাতের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময় সৈকতভূমিতে তাদিগকে উত্তীর্ণ করেছে।

আজ দুর্যোগ-বিপাকে জীর্ণ সেই খেয়াতরী আমাদের কল্যাণ-হস্ত-স্পর্শে, আমাদের শ্রমসাহায্যে পুনর্বার কার্যক্ষম হবার, নবকলেবর ধারণ করবার অপেক্ষা রাখে।

অভিসম্পাতের মধ্য দিয়ে নয়, দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে নয়—পরন্তু প্রেম ও প্রীতির অমৃত নিষেকে, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার অমোঘ শক্তিতে—সেই পুরাতন, জীর্ণ খেয়াতরীটিকে নূতন করে সাজিয়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ কর।

সহায় হবেন ভগবান, সহায় হবেন গুরুদেবতা।

অতি সংক্ষেপে, স্বামীজির প্রথম ভাষণের এই মর্মকথা।

কিন্তু শুধু এইটিই নয়।

'ভারতের ঋষিকুল'

'বাস্তব জীবনে বেদান্ত'

'ভারতের ভবিষ্যৎ'...

প্রভৃতি আরও তিন চারটি বক্তৃতা তিনি সেবার প্রদান করেছিলেন মাদ্রাজে।

তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর বহ্নিকণার তপ্ত স্পর্শে আত্মসম্বিৎ প্রাপ্ত হয়েছিল মাদ্রাজ, বহুকাল-বিস্মৃত অতীত ঐতিহ্য যেন নূতন করে তার কাছে বিশেষ গৌরব ও মর্যাদার বস্তু বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

বস্তুত, সেবার নয়দিন মাত্র মাদ্রাজে অবস্থান করে সে প্রদেশবাসীকে—নয় শতাব্দীর দীর্ঘপথ যেন অতিক্রম করিয়ে ছিলেন স্বামীজি।

গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতায় কুখ্যাত মাদ্রাজ—তাঁর শক্তিপূর্ণ দিব্যস্পর্শে নবযুগের সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হয়েছিল যেন নয়দিন মাত্র সময়ে।

নয়দিন পরে আবার স্বামীজি যাত্রা করলেন জাহাজে বঙ্গোপসাগর পথে।

এবার লক্ষ্য বাংলা, এবার লক্ষ্য বাংলার কেন্দ্রস্থান কলকাতা।

*　　*　　*　　*

বাংলা দেশ!

তাঁর স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্য জন্মভূমি। যার মাটির সঙ্গে নাড়ির নিগূঢ় সংযোগ ছিল স্বামীজির—সেই শ্যামসবস সোনার জন্মভূমি তাঁর বাংলা!

একদিন দু'দিন নয়, প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে—একদিন একবস্ত্রে,

নগ্নপদে দন্ডকমণ্ডলুহস্তে কলকাতা ত্যাগ ক'রে, বাংলা দেশ ত্যাগ করে, সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিব্রাজক বেশে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ!

সেদিন, অন্ধকারে ঢাকা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দীর্ঘ দিবসগুলি নীরবে অপেক্ষমান ছিল সম্মুখে।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত ছিল উদ্বেগাকুল। কেবল ভিতরের প্রচণ্ড শক্তি ও অটল বিশ্বাস অভিব্যক্তির পথ-সন্ধানে মাথা কুটে মরছিল সেদিন।

'Some day I shall fall upon the society like a thunder-bolt.'...

এই ছিল তখনকার মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার একমাত্র প্রকাশ। কিন্তু কবে অথবা কীভাবে সমাগত হবে সেইদিন তা কেবল জানতেন ভাগ্যবিধাতা কেবল জানতেন সর্বকালদর্শী যিনি সেই পুরুষপ্রধান।

আর আজ! আজ দ্বাদশ বৎসর পরে—মানবসমাজের অশেষ সৌভাগ্য-বশে 'সেইদিন', সেই '*Someday*' সত্যি হয়েছে সমাগত।

কেবল বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমগ্র সভ্য-জগতের চিন্তাক্ষেত্রে অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি করে—

বস্তু থেকে ভাবে,
স্থূল থেকে সূক্ষ্মে,
ভোগ থেকে ত্যাগে,
মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে...

যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে চালিত করবার সার্থক প্রয়াসে নবযুগের উদ্বোধন করে স্বদেশের বুকে প্রত্যাগত আজ স্বামী বিবেকানন্দ।

সমগ্র কলকাতা, সমগ্র বঙ্গদেশ আজ তাই নিজ বিজয়ী বীর সন্তানকে দেখবার জন্য, অভিনন্দিত করবার জন্য মাদ্রাজের চাইতেও অধিকতর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি স্নিগ্ধ, শিশিরস্নাত শীতের

প্রভাতে—তপস্যাদীপ্ত, প্রসন্নশ্রী স্বামীজি পদার্পণ করেছিলেন বাংলায়, মহানগরী কলকাতায়।

এখন থেকে অর্ধ শতাব্দীকালেরও পূর্বেকার কথা।

তখনকার কলকাতায় আজকের মত এত ব্যাপক কৃত্রিমতা ছিল না। আসলের চাইতে নকলের দাম তখনো এত বেশী উপরে ওঠেনি!

ভূয়া প্রোপাগ্যাণ্ডা আর রেডিও মারফৎ আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ তখনও মহানগরীর আকাশ-বাতাস আজকের মত দূষিত, বিষাক্ত ক'রে তোলে নি।

কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা আগ্রহ ও শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় দলবদ্ধভাবে কোন সৎকাজে এগিয়ে যাবার শক্তি ছিল এই মহানগরীর।

লাউড্ স্পীকারের মারফৎ সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত অভিসন্ধিপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও দিক-নির্ণয়ের সামর্থ্য ছিল তার।

তাই, সেই পুণ্যশ্লোক মনীষীকে দেখবার জন্য, সেই ঋষিকল্প, দেশ-প্রাণ মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য কলকাতার পথে পথে, চৌরাস্তার সংযোগস্থলে, শিয়ালদহ স্টেশনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাজার হাজার নরনারীর বিরাট সমাবেশ ঘটেছিল সেদিন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই—সংবাদপত্র আর রেডিও প্রচারের সহায়তা ছাড়াই।

ফলে-ফুলে, মাল্যে-স্তবকে—আচ্ছাদিত করেছিল তারা স্বামীজিকে। ঘোড়া খুলে দিয়ে ছেলেরা নিজ হাতে টেনেছিল তাঁর শকটখানি। অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় সমগ্র মহানগরী যেন একযোগে প্রণতি জ্ঞাপন করেছিল সেই দেবতুল্য অগ্নিমন্ত্র মনস্বীকে।

এরপর—যথাসময়ে আহূত হয়েছিল আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা সভা। শোভাবাজারের এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে ছয়-সাত হাজার বিশিষ্ট পৌরবাসী সম্মিলিত হয়ে সভক্তি মানপত্র প্রদান করেছিল স্বামীজিকে।

একথা আমরা পূর্বে বলেছি, স্বামীজির উক্তির বিবৃতিপ্রসঙ্গেই বলেছি, কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না স্বামী বিবেকানন্দ, কোন রাজ্যবিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষও ছিলেন না তিনি।

তথাপি, সেই পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্বেকার অর্ধজাগ্রত ভারতবর্ষেই সহস্র সহস্র নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলিপুটে, ভক্তিবিনম্রচিত্তে এই সর্বত্যাগী যতীকে

অতি অপূর্ব সম্মান দেখিয়েছিল, গভীর ও অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল। সে ব্যাপারের মধ্যে ভারতেতিহাসের যে মর্মকথাটি লুক্কায়িত আছে—তার আশা-আকাঙ্ক্ষার যে-মূর্তিটি প্রকাশমান — তারি দিকে আধুনিক যুগের তরুণসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই সেই সব অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভিবাদনের কিঞ্চিৎ বিশদ বিবরণ আমরা প্রদান করলাম। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

কলকাতার পৌরবাসীদের প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন স্বামীজি শোভাবাজারের সেই মহতী সভায়। বাংলাদেশ তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত শান্তিবাণীর অমরছন্দ সেই প্রথম প্রত্যক্ষশ্রবণে শুনতে পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

ধর্মতত্ত্বের কোন বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি অগ্রসর হননি সেদিন। ভাবী কর্মধারার বিস্তৃত কোন পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেননি সে সভাতে। শুধু অকুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়েছিলেন নিজ মহান গুরুকে—যাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে বাংলা, ধন্য হয়েছে ভারতবর্ষ, ধন্য হয়েছে জীবধাত্রী বসুধা। যাঁর পুণ্য আশীর্বাদ ও অভ্রান্ত ইঙ্গিতে জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি স্বয়ং। আর অকৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করেছিলেন পরিপূর্ণ অন্তরে প্রাণপ্রিয় তাঁর দেশবাসীকে, কলকাতার নাগরিকদিগকে,—যে কলকাতার ক্রোড়ে তাঁর জন্ম, যার ধূমধূলির স্পর্শে বর্ধিত ও পুষ্ট তাঁর শৈশব-শরীর।...

তারপর, অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে সিংহবীর্য সেই বিরাট-পুরুষ সমগ্র-জাতির আত্মিকশক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য, অন্তরের সুপ্ততেজ উদ্দীপ্ত করবার জন্য হেনেছিলেন যেন প্রচণ্ড আঘাত।

কী সে ওজস্বিনী ভাষা, কী সে মর্মভেদী আবেদন! স্তব্ধবিস্ময়ে আজিকার ক্ষুব্ধ আকাশে কানপেতেও সেই অমিতবীর্য-সম্পন্ন সনাতন বাণীর প্রতিধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাই।.

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত...

Youngmen of Calcutta—arise, awake, for the time is propitious, be bold and fear not...

তমিস্ররজনীর ভীতিবিত্রস্ত দুর্বলতা দূরে নিক্ষেপ কর।

ঐ শোন, 'অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ।'...

Think not that you are poor, that you have no friend...I have faith in my countrymen, and especially in the youth of my country...

The youths of Bengal have the greatest of all tasks that have ever been placed on the shoulders of youngmen...

সুতরাং, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

Aye, from the youth of Bengal, with the immense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come the heroes, who will march from one corner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers. And this is great work before you....

বাধা যত প্রচণ্ডই হোক, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যা যত প্রবলতায়ই আত্মপ্রকাশ করুক—উন্নত মস্তকে ও নির্ভীক প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হও। ভয় নেই।

Mountain high though the difficulties appear, terrible and gloomy though all things seem, they are but Maya.

Fear not, it is banished. Crush it, and it vanishes. Stamp upon it and it dies.

এমনি বিশিষ্ট সুর ও নূতন ধরণের মহান বার্তা, *special message* কয়েকটি সুবিখ্যাত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই সময় ঘোষণা করেছিলেন তিনি বাংলাদেশে!

সে-সকল অব্যর্থ অমোঘবাণীর ফল ফলতেও অবশ্য বিলম্ব ঘটে নাই।

বস্তুত, কতকাল, কতযুগ ধরে পরাধীনতার গুরুভারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়েছিল বাংলা, ঘুমিয়েছিল তামাম হিন্দুস্থান। ভাবের নদীতে তার

জোয়ার আসত না, নবকিশলয়ে সজ্জিত হত না তার উদ্যান-বীথিকার তরুলতা।

আজ অকস্মাৎ সঞ্জীবনী মন্ত্রের অমোঘপ্রভাবে সমগ্র জাতির জীবনে এসে গেল যেন বিপুল প্লাবন, উন্মত্ত জোয়ার।

শিরায় শিরায় উষ্ণ-শোণিত প্রবাহে কর্ম-চঞ্চল হয়ে উঠল যেন সারা দেশ। ক্ষণিক উত্তেজনার কোন ফাঁকা কথা নয়, সাময়িক ভাবাবেগের কোন অর্থহীন অভিব্যক্তিও নয়; পরন্তু, নিদ্রোত্থিত জাতির জীবন চঞ্চলতার সত্যিকার প্রকাশ সেটি। উত্তরকালে, ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিবিধ সাধনক্ষেত্রে যে-শক্তি ও উদ্বুদ্ধ চেতনা তাকে কঠোর আত্মত্যাগ ও মহান প্রযত্নে নিযুক্ত করেছিল—যার প্রভাবে বাধামুক্ত হয়েছিল তার জয়যাত্রার দুর্গম পথ—সে শক্তিরই সার্থক উদ্বোধন ছিল সেটি।...

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ পরবর্তীকালে তাই লিখেছিলেন,...

If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal—the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi—it is due to the initial shock that it received from Vivekananda...

এমনি করে, কালেকালে—মহৎজীবনের নিষ্কাম প্রয়াসে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি যেমনভাবে সাধিত হয়েছে সর্বদেশে—তেমনি করেই স্বামীজির মর্মস্পর্শী আবেদনের আর তাঁর ভাস্বর জীবনের অনতিক্রম্য আকর্ষণে—কর্মের পথে, আত্মোৎসর্গের পথে যাত্রা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল উদ্বুদ্ধ উদার যুবকদল। জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সেই খাঁটি মানুষের দল—যারা স্বামীজির অতি প্রিয় প্রাণের বস্তু ছিল, দেশের ছিল ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা।

ফলে, সেই তীব্র ও ব্যাপক কর্মৈষণাকে সুসংহত করে ফলপ্রসূপথে নিয়োজিত করবার জন্য এই সময় সংঘ গঠনের প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামীজি, এবং অচিরে অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে, গুরুভাইদের নিয়ে, উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের' করেছিলেন উদ্বোধন,—যে মঠ ও মিশন বিশিষ্ট উপায়ে ব্যক্তিগত সাধনাকে জাতিগত সাধনার সঙ্গে করবে

একীভূত, বনের বেদান্তকে ঘরের ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 'বহুজন-হিতায় বহুজন সুখায়' যুগোপযোগী সঙ্ঘচক্ররূপে হবে ক্রিয়াশীল।

আজ অর্ধশতাব্দীকাল মধ্যে সেই সঙ্ঘেরই শাখা প্রশাখা পূর্ব গোলার্ধের এক প্রান্ত থেকে পশ্চিম গোলার্ধের অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। জনসেবার বিভিন্ন পন্থার মধ্য দিয়ে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মর্মকথা প্রচারের মধ্য দিয়ে আপনার সার্থকতাও সে বহুলাংশে করেছে সপ্রমাণ।

কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় কথা,...অনেক বেশী আশার কথা এই যে, সেই সঙ্ঘেরও গণ্ডী অতিক্রম ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল জীবনাদর্শ এবং বিবেকানন্দের দৃপ্তবাণী আজ সমগ্র সভ্য জগতের চিন্তাক্ষেত্রে দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। সাহিত্যে, দর্শনে কাব্যে—প্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়ে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, আশান্বিত হচ্ছি। যদিও তাদের বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে আমরা করতে পারছি না। সুতরাং সে কথা এখন থাক।

আমরা স্বামীজির বাংলাদেশে প্রথম পদার্পণের কথা বলছিলাম। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সে-কথা।

ফেব্রুয়ারী থেকে মে—প্রায় তিন চার মাস কাল এই সময় তিনি বাংলা-দেশে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় মধ্যে বিরামহীন, বিশ্রামহীন প্রয়াসে—কর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে ক্লান্ত-দেহ স্বামীজি কতকটা বিশ্রামের আশায় আর কতকটা উত্তর-ভারতে তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন হিমশীতল হিমগিরির দিকে—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে এবং পথে পথে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

কলম্বো থেকে আলমোড়া—ভারতের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্ত অবধি—এমনি করেই প্রচারিত হয়েছিল তাঁর অগ্নিময় যুগবাণী, ঝঙ্কৃত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে জাতির সাধনা ও সঙ্কল্পের নূতনতম অভিব্যক্তি ও ব্যাখ্যা।

Everyman is potentially divine. Every man is potentially Brahma...

সেই ব্রহ্মচেতনা, সেই সুপ্ত ভাগবৎ শক্তি জাগ্রত করবার নিরলস সাধনাই ধর্মসাধনা। এই তাঁর বাণীর প্রথম ও প্রধান সূত্র। ভারতবর্ষ সেই সাধনারই ভিত্তিতে তার সকল প্রয়াসকে গ্রথিত করতে, রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে যুগে যুগে...

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই তত্ত্বটি সম্যক উপলব্ধি ক'রে পরমার্থের অব্যাহত আনন্দধারায় অবগাহন করবার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে সে জপ ক'রে এসেছে সেই একই মন্ত্র—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান মা বিভেতি কদাচন,
মা বিভেতি কুতশ্চন।...

রাজনৈতিক কীর্তি বা প্রতিপত্তি, সামরিক আধিপত্য বা প্রতাপ—এসব কোনকালে ভারতবর্ষ তার জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে নি, ভাবীকালেও করবে না।

Political greatness or military power was never the mission of our race..and mark my words, it will never be.

অতএব, ত্যাগের ভিত্তিতে, আর্তের সেবার মধ্য দিয়ে আত্মিকশক্তির বিকাশ-প্রচেষ্টাতেই তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর বাকী যাকিছু প্রয়োজন তা স্বতঃই এসে যাবে।

Renunciation and Service are the national ideals.

Intensify her in those channels and the rest will take care of itself...

Aggressive Hinduism is the spiritual basis and the masses form the material basis—এই আমাদের ভারতবর্ষ।

তথাকথিত রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।

God and truth are my only politics..all else is trash.

* * * *

শ্রদ্ধাহীন হয়েই, আত্মবিশ্বাস হারিয়েই পতিত হয়েছে জাতি। নীচ-

স্বার্থপরতা আর সংকীর্ণ মনোভাব আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। সেই পাপ, সেই গ্লানি স্খালন ক'রে—উদ্বুদ্ধ, পরিশুদ্ধ হে অমৃতের সন্তানগণ—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।...

'ভগবান ভগবান' ক'রে, 'ধর্ম ধর্ম' ক'রে কোন্ তুচ্ছ অর্থহীন সংস্কার-পুঞ্জের পিছনে পিছনে ছুটে চলেছ ভারতের বদ্ধদৃষ্টি নরনারীর দল?

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্যসার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর—এক তরী করে পারাপার।
তন্ত্র-মন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন,—ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম
প্রেম, প্রেম—এইমাত্র ধন।...

—সেই বিশুদ্ধ, কাম-গন্ধ-হীন প্রেমকে জাগ্রত কর অন্তরে।

ভাস্বর-জ্যোতি ব্রহ্মকে প্রকাশ কর, নিরাবরণ কর সাধনায়, আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য বিস্মৃত হও অন্য সকল দেবতা, অন্য যাবতীয় ভগবান; ...আরাধনা কর, সেবা কর—সেই একমাত্র দেবতাকে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ;' যিনি নিত্য, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার।'...

What vain God shall we go after and yet cannot worship the God that we see all around us—Our Own Race..the *Virat*?

* * * *

জ্ঞানের আলো নিয়ে, শিক্ষার আলো নিয়ে...পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়। মনে রেখো, শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি।

আবার শুধু যুবশক্তি বা জনসাধারণের উদ্দেশেই নয়, নারী-সমাজের উদ্দেশেও তাঁর অনুরূপ বাণী।

Believe in India and in our Indian faith. Be strong and hopeful and unashamed and remember that with something to take—Hindus have immensely more to give than any other people in the world.

অন্যদিকে, ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, যে সাংস্কৃতিক সম্পদ একদা দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে—পাহাড়গিরি, মরু-কান্তার অতিক্রম ক'রে

তার সাধকগণ প্রচার করত—সেই অক্ষয়, অনবদ্য সম্পদ আবার হিংসামত্ত, সংশয়-ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে বিতরণ করবার জন্য—বহির্গত হও, আর্য বংশধরগণ! নব্যবাংলার ভাব-সমৃদ্ধ-জীবন উত্তরসাধকগণ!...

You, youngmen of Bengal do not look up to the rich and great men who have money.

The poor did all the great work of the world. Be steady and above all, be pure and sincere to the back-bone...Have faith in your destiny.

নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে অকপট অন্তঃকরণে ব্রতী হও, অগ্রসর হও—সিদ্ধি অবশ্য করায়ত্ত হবে।

Calm and silent and steady work and no newspaper humbug, no name-making. You must always remember...

এই প্রকার তেজোদ্দীপ্ত বাণী আর অগ্নিগর্ভ আবেদনের মধ্য দিয়ে সচেতন করেছিলেন তিনি জাতিকে, নিরলস কর্ম-সাধনায় প্রবুদ্ধ করেছিলেন ভারত-ভারতীকে।

তার জয়যাত্রার সপ্তাশ্ববাহিত রথচক্র এমনি করেই স্বামীজির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রেরণায়—উদয়দিগন্ত থেকে শুরু করেছিল তার ঐতিহাসিক অভিযান বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে।

* * * *

কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে, কাঠগুদাম ছুঁয়ে, পৌঁছেছিলেন স্বামীজি আলমোড়ায়। আবার আলমোড়ায় কয়েকদিন থেকে বেরেলী হয়ে, মুরী হয়ে গিয়েছিলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

কাশ্মীর থেকে পুনঃ লাহোর হয়ে ক্ষেত্রী, কিষেণগড়, আজমীড়, যোধপুর—এককথায়, প্রায় সমগ্র রাজপুতনা পরিভ্রমণ করে প্রায় ছয়সাতমাস-কাল অন্তে ফিরেছিলেন স্বামীজি কলকাতায়—১৮৯৮এর প্রথম দিকে, জানুআরীতে।

* * * *

'গঙ্গার পশ্চিমকূল,—

বারাণসীসমতুল।'—

সেই পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে রামকৃষ্ণ-সংঘ তখন তার নিজস্ব মঠ-বাটিতে স্থানান্তরিত এবং সেইখানে শুরু হয়েছে সংগঠনের কাজ, মানুষ তৈরীর কাজ।...

Imparting of the 'man-making, life-giving and character building education.'

স্বামীজির যোগ্য গুরুভ্রাতাগণ নবাগত যুবক কর্মীদের গ'ড়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন। ইউরোপ-আমেরিকা থেকেও—ভগিনী নিবেদিতা, মিস্ ম্যাক্লিয়ড্ প্রমুখ কর্মীদল—যাঁরা ভারতবর্ষের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন—তাঁরা অনেকে এসে পেঁাছেছেন।

আলমোড়ার পাহাড়-ঘেরা শান্ত-নীরবতায় স্থাপিত হয়েছে আশ্রম—'অদ্বৈত আশ্রম।' মাদ্রাজে, মুর্শিদাবাদে...কর্মকেন্দ্র স্থাপনেরও চলছে আয়োজন। প্রতিদিন দলে দলে আসতে শুরু করেছে—বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য নরনারী...দেশের দূর-দূরান্ত থেকে—আর্ত যারা, পিপাসু, জিজ্ঞাসু যারা, বিভিন্ন কল্যাণ-কর্মের নিষ্ঠাবান সাধক যারা...তাদের চলছে অবিশ্রাম আসা-যাওয়া।

এক কথায়, বিশাল ভারতের সদ্য নিদ্রোত্থিত সমষ্টিপ্রাণ—স্বামীজির নির্দেশের জন্য, আশীর্বাদের জন্য—উন্মুখ হয়ে তাঁর চারদিকে যেন সমবেত হতে শুরু করেছে।

'তুই হবি বিরাট বটবৃক্ষের মত,—তোর জীবনের যোজন-বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার ছত্র-ছায়ায় শতকোটি তাপিত, আর্ত নরনারী আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে।'—তদীয় উত্তর-জীবন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই যে ভবিষ্যদ্বাণী তা এখন বর্ণে বর্ণে সফলতা লাভ করেছে।

চতুর্দিকের এমনি অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেই বস্তুতঃ স্বামীজি পুনর্বার ফিরেছিলেন কলকাতায়।...কিন্তু খুব বেশীদিনের জন্য নয় এবারও। সব-শুদ্ধ—তিন চার মাস মাত্র সময়ের জন্য।

তারপর, কতিপয় পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাশিষ্যাদের নিয়ে, মুখ্যতঃ তাদেরই

কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেবার জন্য—আবার তিনি যাত্রা করলেন হিমালয়ের দিকে—আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে।...

স্বামীজি বলতেন,—'আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। তা, আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তটাই চক্কর।'

বাস্তবক্ষেত্রেও তাই দেখি—জীবনভোরই তিনি রমতা সাধু, যুগব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জীবনভোরই তিনি পরিব্রাজক। তবু কিন্তু একথা মনে হয় যে, এবারকার তাঁর হিমালয় যাত্রার উদ্দেশ্য প্রথমবার থেকে বহুলাংশেই পৃথক ছিল—লক্ষ্যেও বটে, প্রণালীতেও বটে। তাঁর কর্মশ্রান্ত দেহমন হিমালয়ের স্তব্ধ-গভীর নীরবতার জন্য যতই উৎসুক হয়ে থাকুক না কেন একালে,—তথাপি সেটি তাঁর এবারকার হিমালয় যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পরন্তু, নিবেদিতা প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা-দানের জন্যই এবার—অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই—কলধ্বনিমুখর মহানগরী ত্যাগ করে, হিমালয়ের নিভৃত নিরালায় প্রবেশ করবার সংকল্প করেছিলেন স্বামীজি।—

কর্মের বহির্মুখীন আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে—শান্ত ও অনুকূল আবহাওয়ায়—ধ্যান তপস্যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দান করবেন, ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত ক'রে তার জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের অংশভাগী করে দেবেন তাদের—এইটি ছিল স্বামীজির এবারকার হিমালয় যাত্রার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য।...

কথাটা আরও একটু বিশদ করে বলি।

সংস্কারের সমষ্টি আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন। তাদের গ্রন্থিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাসক্ত স্বাধীনতা লাভ—সাধকমাত্রেরই সুদুর্লভ জীবন-স্বপ্ন। এদের মধ্যে আবার জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত যে-সব সংস্কার সেগুলি সর্বাধিক দৃঢ়মূল, রক্তের ধারার সঙ্গে সর্বাধিক বিজড়িত। অথচ, সেই সব সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে একদেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশের সেবাব্রত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এক জাতির লোকের পক্ষে অন্য জাতির লোককে ঐকান্তিক স্নেহ-প্রীতিতে আপন বলে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। সেইজন্য, এই অতি দৃঢ় সংস্কার সমূহের বন্ধন থেকে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-

শিষ্যাদের মুক্ত করবার দুরূহ দায়িত্ব এই সময়টিতে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি।

কত গুরুভার, কত জটিল সমস্যাসংকুল, ভিতর-বাহিরের কত বাধা-বিপত্তিপূর্ণ যে ছিল সে দায়িত্ব তা স্বামীজি সম্যক অবগত ছিলেন।

তথাপি অপরিহার্য কর্তব্যজ্ঞানে নিজ অনন্যসাধারণ শক্তি এই কার্যেই তিনি নিয়োজিত করেছিলেন এইকালে।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর—*The Master As I Saw Him, Notes of Some Wanderings* প্রভৃতি অমর-রচনায় এ সময়ের অক্ষয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন—ভাবীকালের উত্তরাধিকারীদের জন্য।

নিত্য নূতন তত্ত্বের স্ফুরণে—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা,—সাহিত্যে, দর্শনে, পুরাণে, ঐতিহাসিক উত্থান-পতনে—যেমন ভাবে যুগে যুগে অভিব্যক্ত হয়েছে—তারি অভিনব নূতন ব্যাখ্যায় তাঁর ধ্যানসিদ্ধ, প্রেমিক মন একান্তভাবে তৎপর হয়েছিল এই সময়।

গভীর ধ্যানতন্ময়তা তাঁকে সম্যক আশ্রয় করেছিল। কোন্ মুহূর্তে, কোন্ তত্ত্ব যে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হবে, উন্মেষিত হবে—তার কোন স্থিরতা ছিল না। তিনি নিজেই বোধ করি পূর্বাহ্ণে সঠিক তা জানতে পারতেন না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে-সব তত্ত্বোপলব্ধির পরম মুহূর্ত-গুলির জন্য অপেক্ষমান থাকত সর্বদা!...

কী দিব্য আনন্দে, কী অপার্থিব জ্ঞানসম্ভারে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল তাদের সেই আলমোড়া—নৈনীতালের বিচিত্র দিনগুলি তা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের পূর্বর্বণিত দিনগুলিরই আর এক অনুপম নূতন সংস্করণ ছিল যেন এখানকার দিনগুলি। ভগিনী নিবেদিতার ভাষা একটু উদ্ধৃত করে দি'—

Beautiful have been the days of the year. In this the ideal has become the Real...We have learnt something of the mood in which new faiths are born, and of the Persons who inspire such faiths...

To those who have known such hours, life is richer and sweeter and in the long nights even the wind in the palm trees seems to cry—*Mahadeb! Mahadeb! Mahadeb!...*

তথাপি, এ সকল সত্ত্বেও কিন্তু একথা সত্য যে, সেই একান্ত ধ্যান-তন্ময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্মুখীনতার মধ্য দিয়েও, সেই প্রশান্ত, বিজন-প্রদেশে নিত্যনূতন উপলব্ধির মধ্যেও—ভারতবর্ষের চিন্তা তাঁকে উন্মাদ করে রেখেছিল।...

এই সময়,

'India throbbed in his breast, India beat in his pulses.'

ভগিনী নিবেদিতা সেই অবস্থাটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরই ভাষায়...

India was his day-dream, India was his nightmare...

He was a born lover, but the queen of his adoration was his mother-land.

ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া অন্যান্য দু'চারজনের দু'একটি অনুরূপ উক্তিও উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে—কিন্তু সে থাক্।

আজ তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কেউ আর বড় জীবিত নেই। ভারতের নবযুগের বিচিত্র ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় যোজনা করে আজ তাঁরা লোকন্তরে।

শুধু পুঁথির পাতার অক্ষয় বন্ধনে বন্দী হয়ে—তাঁদের যে-ঐকান্তিক নিবেদন আমাদের কর্ণে এসে পেঁছায়, আঘাত করে আমাদের মর্মমূলে—তারই সকরুণ ধ্বনির মধ্যে আজও আমরা যেন শুনতে পাই—

'Swamiji, how best can we help you?'

'Love Lndia,'...

* * * *

স্বামীজির সঙ্গে বরিশালের স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীবাবুর এই কালের সাক্ষাৎকারটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

স্বামীজি তখন আলমোড়ায়। বৃষ্টিধৌত, পরিচ্ছন্ন আলমোড়ার আকাশতলে প্রসন্ন প্রভাত সেদিন রূপালী ছটায় প্রতিফলিত।

স্বামীজির অবস্থান-সংবাদ পেয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে অশ্বিনীবাবু প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজিকে,—'সমগ্র পৃথিবী আপনি পরিভ্রমণ করেছেন স্বামীজি! লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে অপূর্ব ধর্মভাব সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত করেছেন। কিন্তু আমাদের দুঃখিনী জন্মভূমির মুক্তি কোন্ পথে তা কি আপনি স্থির করতে পেরেছেন?'...

—'নূতন ক'রে আমি কিছুই স্থির করিনি অশ্বিনীবাবু,'—উত্তর করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ,—'তবে বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে আমি পে'ছৈছি যে—ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড...*the very essence of our being*...আমাদের যা-কিছু প্রগতি-প্রয়াস তা ঐ ধর্মের মধ্য দিয়ে আর সত্যের আশ্রয়েই করতে হবে।

অন্যথা ব্যর্থ হবে পরিশ্রম, পণ্ড হবে সর্ববিধ চেষ্টা।

—'কিন্তু, কংগ্রেসের কর্মপন্থায় কি আপনার কোন আস্থা নেই?'—

'কিছুমাত্র না,' উত্তর করেছিলেন স্বামীজি। 'ভারতের প্রাণশক্তির আধার-স্বরূপ যে অগণ্য জনসাধারণ—যাকে 'mass' বলা হয়ে থাকে, তাকে জাগ্রত করবার, উন্নত করবার চেষ্টা না করে—কেবলমাত্র কতগুলি প্রস্তাব পাশ করলেই কোন কাজ হবে এ আমার বিশ্বাস নয়।'

'If the Congress docs anything for the masses—it has my sympathy.'

তারও কতকাল পরে, কত বৎসর অন্তে—গণসংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল কংগ্রেস এবং সেই পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েই প্রভূত শক্তি অর্জন করেছিল সে উত্তরকালে। জাতির আধুনিক কালের দ্রুত-পরিবর্তনশীল ইতিহাসে সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

'ধর্ম' বলতে কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি বোঝাতে চান কিনা—এ প্রশ্নও অশ্বিনীবাবু এই সময় স্বামীজিকে করেছিলেন।

উত্তরে বলেছিলেন স্বামীজি,—

সকল মতবাদের অপরিসর গণ্ডী অতিক্রম করে,...সকল ধর্মের আনুষ্ঠানিক সংকীর্ণতা দূরীভূত করে...এক উদার, সার্বভৌমিক, যুক্তিসহ, সর্বমত-সমঞ্জসা মানবধর্ম নিজ জীবনালোকে প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন এ-যুগে। আমি সেই কথাটিই পৃথিবীর বুকে প্রচার করতে, প্রতিষ্ঠা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেলাম।

আমার মতে—ধর্ম অর্থই শক্তি।

The religion that does not infuse strength into the heart is no religion to me—be it of the Upanishads, the Gita, or the Bhagabatam. Strength is religion and nothing is greater than strength....

To be as deep as the ocean and as broad as the sky. —এই-ই ধর্ম।

এই কালের আরও দু'তিনটি ঘটনা—ক্ষুদ্র হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা এখানে উল্লেখ করব,—

প্রথম ঘটনাটি,—তাঁর অতিবিশ্বস্ত সাংকেতিক লেখক গুড্-উইন, যাকে তিনি সস্নেহে 'মাই ফেইৎফুল গুড্-উইন' বলে উল্লেখ করতেন—তাঁর আকস্মিক মৃত্যু।

এ-মৃত্যু স্বামীজিকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল, আলোড়িত করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা, তদীয় অতি বিখ্যাত *Kali the Mother* শীর্ষক কবিতা রচনা। তাঁর এই কালের অন্তর্জীবনের বিচিত্র চিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে এই কবিতাটি অমরত্ব লাভ করেছে।

তৃতীয় ঘটনা—তাঁর অমরনাথ-ক্ষীরভবানীর গুহামন্দির দর্শন।

সেপ্টেম্বর মাসের ত্রিশে তারিখ একেবারে নিঃসঙ্গ, কৌপীন-সম্বল স্বামীজি সেবার ক্ষীরভবানীর দুর্গম গুহামন্দির দর্শনে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রায় সপ্তাহকাল নির্জনবাসের পর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন শিষ্যবর্গের মধ্যে।

কিন্তু, ক্ষীরভবানীর মন্দিরের একান্ত অপ্রত্যাশিত অথচ অতি স্পষ্ট

এক দৈববাণী—তাঁর অন্তরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ ভাবান্তর আনয়ন করেছিল।

শিক্ষাদাতা ও আচার্য বিবেকানন্দের প্রচ্ছন্নতার অন্তরালে অখণ্ডের ঘরের জ্যোতিঘনতনু যে-দেবশিশু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এতদিন ছিল আত্ম-গোপন ক'রে—আজ অকস্মাৎ সেই দৈববাণীর প্রভাবে সে-যেন চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

বহুদিন-বিস্মৃত তাঁর অতিপ্রিয় সেই সুর-তরঙ্গটি অন্তরের অন্তঃস্থলে চকিতে যেন পুনঃ জাগ্রত হয়েছিল এক অপরূপ করুণ মূর্ছনায়...

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?...

ক্ষীরভবানীর মন্দির থেকে ফিরে এসেই তাই তিনি বলেছিলেন, 'কর্মী বিবেকানন্দ, নেতা বিবেকানন্দ, গুরু বিবেকানন্দ মরে গেছে—আর ফিরছে না!

মহামায়ার জয় হোক, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি তাঁর দাস... তাঁর চরণাশ্রিত সন্তান মাত্র।'

* * * *

এমনি করে, হিমালয়ের প্রশান্তগাম্ভীর্যের মধ্যে—শ্রীনগর, আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতির শব্দহীন ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে—পাশ্চাত্ত্য কর্মীদের শিক্ষা-দান ব্যপদেশে—প্রায় ছয়মাসকাল এক অনুপম জীবন যাপন ক'রে—১৮৯৮-এর একেবারে শেষদিকে ফিরেছিলেন স্বামীজি কলকাতায়। আর সেই সময় থেকে ১৮৯৯-এর জুন মাস অবধি—সঙ্ঘের নিজস্ব বাটীতে, বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

তদীয় জীবনচরিতকার এই কালের অধ্যায়টিকে—*'Swamiji with his own people'* বলে অভিহিত করেছেন।...

সঙ্ঘের কার্যাবলী তখন আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ঢাকা, কাশী প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা হয়েছে, ইংরেজি

ও বাংলায় তিনটি মাসিক পত্রিকা বেদান্তের উদার মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে, বহুলাংশে তরুণ ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা-দানের কাজ হাতে নিয়ে—প্রিয় গুরুভাইদের সাহচর্যে, '*With his own people*'—সম্পূর্ণ আপনভাবে ভদ্রতা-অভদ্রতার সকল আদব-কায়দা বর্জন করে,—যাকে ইন্‌ফরম্যাল বলে, সেইভাবে কতগুলি দিনযাপন করবার সুযোগ এই সময় স্বামীজি পেয়েছিলেন বহুকাল পরে।

বস্তুতঃ, বাহ্যিক নিয়ম-আচার, যা তিনি কোনদিন বরদাস্ত করতে পারতেন না—অথচ পাশ্চাত্ত্যের কর্মক্ষেত্রে, কতকাংশে হলেও, মেনে চলতে হত—সেগুলির পীড়াদায়ক বেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ-শোভিত বিশ্বধর্ম মহামন্দিরের পাদপীঠে—অব্যাহত নিশ্চিন্ততায় কেটেছিল তাঁর এই সময়ের দিনগুলো।

তাঁর জীবনাখ্যায়িকায়, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ নামক গ্রন্থে—এ জীবনের পরিচয় আছে।...

ইতিমধ্যে আবার, ইংলন্ড-আমেরিকার কর্মক্ষেত্রও বহুধা প্রসারিত হয়েছে। নূতন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উৎসুক ও জিজ্ঞাসু নরনারী দিনে দিনে, বর্ধিত সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে বেদান্তের বার্তা শুনবার জন্য, গ্রহণ কররাব জন্য।

সুতরাং এই কালে, আর একবার ওদেশে যাবার জন্য—পুনঃ পুনঃ তত্রত্য কর্মী, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ বিশেষ আহ্বান জানাতে লাগলেন স্বামীজিকে।...

স্বামীজিরও শরীর তখন দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ভগ্নপ্রায়, সমুদ্রযাত্রায় স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হতে পারে চিকিৎসকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

ফলে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ২০শে জুন—গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মানসকন্যা নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার স্বামীজি যাত্রা করলেন ইউরোপ-আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কাজেই মোটের উপরে, প্রায় আড়াই বৎসর-কাল এই সময় তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন—১৮৯৭ খৃস্টাব্দের

প্রারম্ভ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যভাগ অবধি। এবং সেই আড়াই বৎসরেরই অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ এ পর্যায়ে আমরা বিবৃত করতে চেষ্টা করলাম। এর যথার্থ তাৎপর্য, জাতির নবজাগরণের ইতিহাসে এর সত্যিকার মূল্য ও গুরুত্ব আজও সঠিক নির্ণীত হয়নি। ভাবীকালের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ ও সায়েন্টিফিক্ মন নিয়ে যথাসময়ে তা নিরূপণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।...

আমরা পর্যায় শেষে শুধু এইটুকু বলি যে,—আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের চলার পথে যে-পঞ্চাশ বৎসর কালকে আমরা সবেমাত্র পিছনে ফেলে এলাম—সেইকালের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জন-জাগরণ—প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে আমরা যতটা অগ্রসর হয়েছি, যা-কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি তার প্রেরণা ও নির্দেশ—এই ক্ষণজন্মা মনীষীর মহৎজীবনের মহত্তর সাধনা থেকে—প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ—আমরা আহরণ করেছিলাম এই আড়াই বৎসরের মহামূল্যবান সময়টিতে। নূতন সূর্যের স্বর্ণরশ্মি মহাব্যোমপথে সহস্রধারায় যাতে আমাদের মলিন গৃহসমূহে প্রবেশ করতে পারে—তার জন্য বিভিন্ন দিকের বাতায়নগুলো উন্মুক্ত করেছিলাম এই কালেই।

উৎসুক ও জিজ্ঞাসুমন, নূতনযুগের তরুণপাঠক—অনুসন্ধানে সে তত্ত্বকে অধিগত করুক, উপলব্ধি করুক—এই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি।

* * * *

অগণ্য মণিখণ্ডে-গ্রথিত বিবেকানন্দ-বাণীর মাল্যখানি স্বল্পায়তন নয়। তার থেকে চয়ন ক'রে—দু'টি-চারটি রত্নগুটিকা আহরণ করা সহজ-সাধ্যও নয়। কিন্তু তাঁর অক্ষয়, অশরীরীবাণী সতত ব্যোমপথে সঞ্চরমান,—অদৃশ্য লিপিতে আকাশগাত্রে অনন্তকালের জন্য খোদিত।

উৎসুক দৃষ্টিমেলে যদি তাকিয়ে দেখি, তবে দেখতে পাব...

আকাশে-বাতাসে আজও দীপ্যমান অনির্বাণ তাঁর বহ্নিবাণীর লোহিত লিখা।

অবহিত হয়ে যদি শ্রবণ করি, তবে শুনতে পাব,...

প্রাণশক্তিতে ভরপুর তাঁর জাগরণমন্ত্রের গম্ভীর নাদ।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে একদা যেমনটি ঝঙ্কৃত হয়েছিল...আজও তেমনি ঝঙ্কৃত হচ্ছে তারা।

'মৃতব্যক্তি পুনারাগত হয় না, গতরাত্রি পুনর্বার আসে না...বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীবও দুইবার একদেহ ধারণ করে না। অতএব, অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজায় আহ্বান করিতেছি, গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি—বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।'...

'আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলা-সহায়ক...এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।' মাভৈঃ ...

[চতুর্থ পর্যায়]

স্বামীজির দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যদেশে যাত্রা—ইউরোপের পথে আমেরিকায়। এবারকার জাহাজ 'গোলকুণ্ডা'।

খিদিরপুর ডক্ থেকে নোঙ্গর তুলে, গঙ্গার বুক চিরে, বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে,—মাদ্রাজ ছুঁয়ে, সিংহল ছুঁয়ে,—দূর ইউরোপের উদ্দেশ্যে, ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে—পাড়ি জমিয়েছিল 'গোলকুণ্ডা'।

১৮৯৩ খৃীস্টাব্দে বোম্বাই বন্দর থেকে অখ্যাত, অপরিচিত ও একক সন্ন্যাসীর সেই প্রথম পাশ্চাত্ত্যযাত্রার দিনটির সঙ্গে আজকের বিশ্ববিশ্রুত, আচার্য বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার সেদেশে যাত্রার কতই না প্রভেদ, কতই না পার্থক্য!

সেদিন জীবনের বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনের তীব্র উৎকণ্ঠায় তপ্তশোণিত প্রবহমান ছিল ধমনীতে। অনির্দিষ্ট পথের দুর্নিরীক্ষ্য দূরপ্রান্ত থেকে—রহস্যময় ভবিষ্যতের আহ্বান ছিল অনুপেক্ষণীয়।

আর আজ? আজ জীবনের কর্ম পরিসমাপ্ত প্রায়, যুগব্রত বহুধা উদ্‌যাপিত।

আজ তাই সাক্ষীরূপে, বহুলাংশে অনাসক্ত, দ্রষ্টারূপে—শান্ত সমাহিত মনে ভেসে চলেছেন স্বামীজি—

'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'।

*　　*　　*　　*

জুন মাসের ২০শে তারিখ খিদিরপুর ডক্ ছেড়ে—জুলাই মাসের ৩১শে তারিখ ইংলণ্ডে পেীছেছিল জাহাজ।—

সুতরাং মোটের উপর একমাসেরও কিছু বেশী কাল—এ যাত্রায় সমুদ্রের বুকে কেটেছিল তাঁর। বিচিত্র চিন্তা ও বিচিত্র অভিব্যক্তির অপূর্ব সম্পদ-সমৃদ্ধ—স্নিগ্ধ, মধুর ও আনন্দোজ্জ্বল ছিল সে দুর্লভ দিনগুলো।

স্বামীজির নিজের হাতের লেখা—রোজ্‌নাম্‌চা ঢঙের পুস্তিকা

'পরিব্রাজক' আর ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত *The Master as I saw Him* গ্রন্থে এ দিনগুলির বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

'পরিব্রাজকের ' পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছিলেন—'তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতের বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি,—এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে; কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি—স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহারও নিদর্শন পাইবে।'—কিন্তু সে-বিষয়ে যথাসময়ে আমরা আলোচনা করব।

এদিকে, নিঃসীম সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে, সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে—লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছিল জাহাজ।—

প্রাচীন যুগের বহুবিচিত্র সভ্যতার কেন্দ্রস্থলসমূহের পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হতে—সে-সব বহুদিনবিস্মৃত অতীতযুগের রহস্যময় গর্ভগৃহে এ-সময় ডুব দিয়েছিলেন যেন স্বামীজি।

সেই পিরামিডের দেশ,—সেই হিক্‌স বংশ, ফ্যারাও বংশ, টলেমি বংশের প্রাচীন ভূমি,...

সেই আরবদের দুস্তর মরু-প্রান্তর।

অদ্ভুত-দৃষ্টি, অদ্ভুত-চলন—অনবরুদ্ধ স্বাধীন হাওয়ার উদ্ধত আরব,... আর তাদের মরুবালুকার কঠিন শুষ্কদেশ!

আরও এগিয়ে,...প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ-পথ সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর।

যে ভূমধ্যসাগরের তটভূমে নানাবর্ণের নানাজাতির মহাসংমিশ্রণ ঘটেছে শতাব্দীতে শতাব্দীতে,...

মিশরে, এশিয়া-মাইনরে, গ্রীসদেশে—ফিনিশিয়, ফিলিস্টিন, ইহুদী, বাবিল, আসীরিয়, ইরাণী—যে-সকল সভ্যতা কালের বুকে চরণ-চিহ্ন স্থাপন ক'রে বিলীন হয়ে গেছে,—প্রাচীনা পৃথিবীর প্রাচীন কাহিনীর সে-সব দেশ।

স্বামীজি বলেছিলেন,—'গল্প নয়, সত্য; সে-সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় বিলীন হয়েছিল। যা-কিছু লোকে জানত,—তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনমাত্র।

এখন পুরানো পাথর, বাড়ীঘর, টালিতে লেখা পুঁথি...আর ভাষা-বিশ্লেষ শতমুখে গল্প কোরচে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য কথা বেরিয়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে?'...

সেই-সব অতি পুরাতন কালের দেশগুলির 'বনরাজিনীলা' প্রান্ত দিয়ে এগিয়েছিল জাহাজ—আর সঙ্গে সঙ্গে মৌন, স্তব্ধ অতীত মুখর হয়ে উঠেছিল স্বামীজির কাছে। মাটির বুকে, পাথরের বুকে সুপ্ত যে-সব চমকপ্রদ কাহিনী, করুণ গাথা তারা কথা বলতে শুরু করেছিল তাঁর কর্ণমূলে।

জীবধাত্রী পৃথিবীর বুকে কত বিচিত্র বর্ণের, কত বিচিত্র দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের—কত অসংখ্য নরনারীর আনাগোনা ঘটেছে যুগে যুগে, মহাকালের অন্তহীন বেলাভূমে শতাব্দীতে শতাব্দীতে অঙ্কিত ও বিলুপ্ত হয়েছে কত সংখ্যাহীন তাদের চরণচিহ্ন।...

আজ তাদেরই সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণে, গূঢ় নিহিতার্থের অবিশ্রাম উদ্ঘাটনে একান্ত তৎপর হয়েছিল স্বামীজির মন এবং তাদেরই মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবনের আরও একটা দিক যেন প্রকটিত হয়েছিল—এই জাহাজ-যাত্রার দিনগুলিতে।...

আবার, কেবল অতীত দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর রহস্যচ্ছায়ার মধ্যেই নয়, দূর দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের কুক্ষিমধ্যেও তাঁর অলোক-দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল এই কালে। বিশেষ করে....সর্বভাবে নিঃস্ব যারা, সর্বদিকে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত যারা, বর্ণাধিকারে চিরপদানত যারা—যাদের দুঃখ ও বেদনা চির দুর্বিসহ ছিল স্বামীজির কাছে—সেই তথাকথিত 'ছোটজাত'দের ভাবীকালের

চিত্রও যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর তীক্ষ্মদৃষ্টির সম্মুখে। আর তাঁর অননুকরণীয়, অগ্নিগর্ভভাষায় সে-সব তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদ্রষ্টার সে দ্বিধাহীন, সংশয়হীন নির্ঘাত উক্তি আজ বাস্তবে রূপায়িত।—

মানবীয় সভ্যতার প্রগতি পথে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রমুখ চতুর্বর্ণের অধিকার পর্যায়ক্রমে চলে এসেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের যুগ অতীত হয়েছে, অতীত হয়েছে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগ।...বৈশ্য প্রাধান্যে-নিয়মিত আজকের পৃথিবী—অর্থশক্তির কুক্ষিগত।

কিন্তু এরও পরিবর্তন আসন্ন। ধীরে ধীরে প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মেই আসছে, আসছে সেই মহাবিবর্তন।...

জাগবে, শূদ্রশক্তি জাগবে, গণশক্তি জাগবে। সেই বিপুল জাগরণযুগ অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে,অনিবার্য গতিতে আসছে। আকাশে কান পেতে সুস্পষ্ট তার পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।...

*　　*　　*　　*

এখন থেকে কতকাল পূর্বেকার এই আখ্যায়িকা, বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা এসব। তখনো আধুনিক সাম্যবাদের জন্মকথা মানবের দূর কল্পনায় নীহারিকাপুঞ্জের মত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ।

বল্‌শেভিজম্‌, কম্যুনিজম্‌ প্রভৃতি আধুনিক মতবাদ তখনো ভবিষ্যতের কুক্ষিমধ্যেই নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে।...

সেই তখনকার অস্পষ্টতার জগতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছিলেন স্বামীজি এসব অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। ইতিহাসের কী সুগভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি যে তাঁর ছিল এ জাতীয় বহু উক্তি থেকে তারই ঈষন্মাত্র পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

আবার, এসব উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর জন্য হৃদয়-রক্তে-সিঞ্চিত সুগভীর সমবেদনার বাণী, আশা-উৎসাহের শক্তিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীও এইকালে উদ্গীত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে।...

'হায়! উচ্চবর্ণের পূর্বপুরুষগণ দু'খানা দর্শন লিখেছেন বলে, দশখানা কাব্য লিখেছেন বলে—তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে। আর

যাদের রুধিরস্রাবে, মনুষ্যজাতির যা-কিছু উন্নতি—তাদের কথা কে বলে, কে ভাবে? কিন্তু অলঙ্ঘ্য কালের বিধান, চক্রাকারে নিয়ত বিঘূর্ণিত মহা-কালের রথের চাকা।

বিলুপ্ত হবে, নিঃশেষে, নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলুপ্ত হবে উচ্চবর্ণের জবরদস্তির বিশেষ অধিকার। নাম-মাত্র-অবশেষ অভিজাতকৌলীন্যের দীর্ঘকালের অত্যাচারের কলঙ্কলেখা অপসারিত হবে পৃথিবীর বুক থেকে।'...

'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে উপলক্ষ্য ক'রে ভারতের শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে 'পরিব্রাজকে'র পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁর সেই অব্যর্থ বাণী আজ শুধু ভারতেই নয়, বিংশ শতাব্দীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিধ্বনিত,—দেশকালোপযোগী ভাবে বিভিন্ন মহাদেশে বিপুল বিক্রমে ক্রিয়াশীল।

'এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা—তোমরা ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল লুঙ্, লঙ্, লিট্ সব একসঙ্গে। ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য—তোমরা ইৎ, লোপ, লুপ্। ভূতভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা। ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশিয়ে যাও—শূন্যে বিলীন হও। আবার নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি—মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার পাশ থেকে...বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে।

এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।...

এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা—এত মুখটি বুজে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!

অতীতের কঙ্কালচয়...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত!

তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাও—অদৃশ্য হয়ে যাও।

কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।'...

শুধু এই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে আরও কত পৌরাণিক কাহিনী—বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব, প্রসার ও অবদানের কত মৌলিক, অনবদ্য বিশ্লেষণ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের কত ব্যাপক তুলনামূলক সমালোচনা —এই কালের সমুদ্র-যাত্রাকে যে অমূল্য করেছিল সহযাত্রীদের কাছে তা বলবার নয়।

কখনো কখনো আবার,—ভারতবর্ষের যে-সব বিরাট আধ্যাত্মপুরুষের সংস্পর্শে যাবার সুযোগ তাঁর নিজ জীবনে ঘটেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারী-বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির দিব্যজীবন এবং পুণ্যকাহিনীও ধ্যান-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে তিনি প্রকাশ করতেন—

অন্য সকলের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে; পওহারীবাবার একটি ক্ষুদ্র জীবনী তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন উত্তর-কালে। কিন্তু সাধারণে অজ্ঞাতপ্রায় রঘুনাথের জীবনকাহিনীটি এ-সময় তিনি বিবৃত করেছিলেন।

রঘুনাথ দাসকে দেখেন নি স্বামীজি।

তাঁর দেহত্যাগের দুইমাস অন্তে—ঘুরতে ঘুরতে, পরিব্রাজক হয়ে রঘুনাথের আশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি এবং শুনেছিলেন তাঁর অদ্ভুত জীবন-কথা।—

*　　*　　*　　*

পল্টনের সামান্য বেতনভুক্ সেপাই ছিল রঘুনাথ। মিষ্টভাষী ও নম্র-স্বভাব বলে সকলের প্রিয় ছিল সে। সত্যবাদী ও কর্মনিষ্ঠ বলে বিশ্বাস-ভাজন ছিল ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের। দিন তার কাটছিল, যেমন সবারই দিন কাটে।

কিন্তু এক আকস্মিক, অলৌকিক ঘটনায়—সহসা তার জীবনে আমূল বিপ্লব ঘটে গেল।

সেদিন গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন সেনা-শিবির। প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত রঘুনাথ আপন মনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সহসা শুনতে পেল সে 'রামনাম' কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি। নিস্তব্ধ রজনীর পরিচ্ছন্ন আকাশে সে সঙ্গীতস্বর কোন্ মাদকতা সৃষ্টি করেছিল কে

জানে? কিন্তু সে সুরতরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ ক'রে চকিতে উন্মনা করে দিল রঘুনাথকে,...অলক্ষ্য কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে মুহূর্তে রঘুনাথ বিস্মৃত হয়েছিল স্থানকাল, বিস্মৃত হয়েছিল নিজের অবস্থা ও কর্তব্যের গুরু-দায়িত্ব।...

নিমেষে হাতের অস্ত্র ও পরিধানের সামরিক বস্ত্র ত্যাগ করে—সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে বেরিয়ে গেল রঘুনাথ।

একদিন নয়, দু'দিন নয়। সেদিন থেকে শুরু করে কয়েকদিন প্রতি রাত্রেই ঘটতে লাগল এ ঘটনা। ক্রমে কর্তৃপক্ষের কানেও গেল সংবাদ। রঘুনাথের কৈফিয়ৎ তলব করা হল। রঘুনাথ কোন কথা গোপন না ক'রে—অকপটে পূর্বাপর ব্যক্ত করল কাহিনী। প্রার্থনা করল কর্তব্যচ্যুতির দণ্ড। কর্নেল সতর্ক করে দিলেন তাকে, এ অপরাধের সামরিক শাস্তি চরমদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এই প্রথমবার ব'লে মার্জনা করা হল তাকে, ভবিষ্যতের জন্য যেন রঘুনাথ সতর্ক হয়।

লজ্জিত রঘুনাথ—স্বীকৃত হয়ে ফিরে এল, ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এল। কিন্তু অলঙ্ঘ্য নিয়তির বিধান। সে রাত্রেও রামনাম কীর্তনের প্রাণোন্মাদকারী জয়ধ্বনি শুনতে পেল রঘুনাথ—'জয় বলো, রামচন্দ্রকী জয়।'

নিজকে সংযত করবার, কর্তব্যে অটল থাকবার—যথাসাধ্য চেষ্টা করল রঘুনাথ। কিন্তু অদম্য সংস্কার-প্রেরণায় মুহূর্তে পুনঃ বিস্মৃত হল জগৎ, বিস্মৃত হল পূর্বাপর—অস্ত্র-বস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর সমস্ত রজনী কীর্তনে অতিবাহিত করে প্রত্যূষে ফিরে এল শিবিরে।

এদিকে কর্নেল স্বয়ং সেদিন বেরিয়েছেন শিবির পরিদর্শনে—অত্যন্ত গোপনে, কাউকে কিছু না জানিয়ে। রঘুনাথের কর্তব্যপরায়ণতার উপর তাঁর অটুট বিশ্বাস—সেইজন্য, রঘুনাথের স্বকীয় উক্তিতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি তিনি। নিজে তাই যাচাই করে দেখবার জন্য—সেদিন গভীর রাত্রে তিনি বেরিয়েছেন।

রঘুনাথের প্রহরাস্থানে গিয়ে দেখলেন রঘুনাথ যথারীতি কর্তব্যে নিযুক্ত আছে। পর পর তিনবার ডাকলেন তাকে—তিনবারই সে জবাব দিল নিজ 'পোস্ট' থেকে।

পরদিন কীর্তন প্রত্যাগত রঘুনাথ বেশ করে চিন্তা করল নিজের অবস্থা। তারপর কর্তব্য স্থির ক'রে, নিজে উপযাচক হয়ে সব কথা নিবেদন করল কর্নেলের কাছে, অব্যাহতি চাইল কর্ম থেকে।...

রাম-নাম ধ্বনি কানে এলেই কেমন আত্মহারা হয়ে যায় সে, নিজের উপর কোন সংযম রাখতে পারে না। চাকুরী করা কাজেই তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক—এই তার প্রার্থনা।

কর্নেল বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ রঘুনাথের দিকে—তারপর কতকটা বিরক্তির সঙ্গেই বললেন,—তিনি স্বয়ং তাকে যথাস্থানে কর্তব্য-নিরত দেখেছেন রাত্রিকালে, তার সঙ্গে কথা বলেছেন নিজে তিনবার। তথাপি, রঘুনাথ একটা মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করে—কেন নিজের সর্বনাশ সাধন করতে উদ্যত হয়েছে? কী তার উদ্দেশ্য? চাকুরী তো ইচ্ছা করলে এমনিই সে ছেড়ে দিতে পারে!...

স্তম্ভিত, বজ্রাহত রঘুনাথ—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কর্নেলের দিকে! সত্যই কি তবে ঘটেছে এ ঘটনা? অসম্ভব কি তবে সত্যই সম্ভব হয়েছে—মাটি, কাঠ, পাথরের এই মরজগতে—নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায়?

রঘুনাথের বুকের মধ্যে তখন উদ্বেলিত নটরাজের প্রলয় নাচন। 'হায় প্রভু!—ভক্তি বিগলিত অন্তরে ভাবছে রঘুনাথ,—'ভকত শরণ, হে মহান! এ দীন সেবকের জন্য হীন প্রহরীর কাজ সত্যই গ্রহণ করেছ তুমি!'

মুহূর্তে সংকল্প স্থির হয়ে গেল। কর্মত্যাগ করে বৈরাগী হল রঘুনাথ। সরস্বতীর তীরে—বিভোর ধ্যানে, রাম নাম তন্ময়তায় কেটে গেল তার দিন।...

এমনি কত মনোহর গল্প ও কাহিনী, কত গভীর আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের স্ফুরণ—অতীতে ও অনাগতে কত অবিশ্রাম যাওয়া-আসা—জলপথের সেই প্রায় একমাসকাল সময়কে যে মধুর করেছিল, চিরস্মরণীয় করেছিল ভাবীকালের নরনারীর কাছে—তা পুঁথির পাতায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাই বলেছিলেন,—From the beginning of

the voyage to the end, the flow of thought and story went on.

One never knew what moment would see the flash of intuition and hear the ringing utterance of some fresh truth—

এমনি অপূর্ব, অবিস্মরণীয় ছিল 'গোলকুণ্ডার' দিনগুলি। —

* * * *

৩১শে জুলাই জাহাজ ভিড়ল লণ্ডনের টিলবারী ডকে। লণ্ডনে পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিন বৎসর পূর্বে, একদা যে দৃপ্তমূর্তিতে লণ্ডনে পা দিয়েছিলেন তিনি, যে 'সাইক্লোনিক হিন্দুর' যোদ্ধৃ-রূপ সেদিন দেখেছিল ইংলন্ড, যে অ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজমের জীবন্ত বিগ্রহ-রূপে প্রকট হয়েছিলেন তিনি সেকালে—

আজ তিন বৎসর পরে, সে মূর্তি সম্পূর্ণ সংহত করে প্রশান্ত, করুণা-স্নিগ্ধ মূর্তিতে স্বামীজি পদার্পণ করলেন লণ্ডনে। নিজের চতুর্দিকে অফুরন্ত প্রেম, স্নেহ ও করুণার অমৃতধারা স্বতঃ বর্ষণ করে আনন্দময় স্বামীজি আজ পিতারূপে, গুরুরূপে প্রতিভাত।...

ছুটির সময় বলে—কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর লণ্ডনও তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও জনবিরল। কাজেই লণ্ডনে কোন বক্তৃতা দিলেন না স্বামীজি এবার, কোন বৃহৎ ক্লাসও নিলেন না। বস্তুতঃ, অতি অল্প কয়েকদিন মাত্রই লণ্ডনে অবস্থান করে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রপথে যাত্রা করলেন আমেরিকায়।...

সুনীল জলধির বিস্তৃতবুকে আবার কাটল দশ-এগার দিন। পূর্বেরই মত—সুগভীর চিন্তাপ্রবাহে সমৃদ্ধ, পরমশিক্ষাপ্রদ নিত্যনূতন কাহিনীর বিবৃতিতে মধুর ও স্মরণীয়!

'চির-অবিস্মরণীয় সেই দশটি দিন আমাদের কেটেছিল সমুদ্রের বুকে। মনে হয়েছিল, বড়ই তাড়াতাড়ি যেন আমরা নিউইয়র্ক পেঁাছে গেলাম। মনে হয়েছিল, মহান গুরুর অতি নিকটসান্নিধ্যে বাস করবার সেই সুদুর্লভ

সুযোগের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও বুঝি আমাদের নেই।'—মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন বিদুষী মহিলা—মিসেস্ ফাঙ্কে।

*   *   *   *

আবার আমেরিকা, আবার নিউইয়র্ক।

প্রাচুর্য ও সম্পদের সেই সুপরিচিত দেশ, কর্মব্যস্ততার প্রচণ্ড কোলাহল-মুখর সেই মহানগরী। একই ভাবে চলমান তার জনস্রোত, একই গতিপথে ধাবমান তার জীবনপ্রবাহ।

নিউইয়র্কে বেদান্ত-কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী ভবন তখন সংগৃহীত হয়েছে। স্বামীজির অন্যতম গুরুভ্রাতা—স্বামী অভেদানন্দ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছেন কেন্দ্রের যাবতীয় কাজ।

স্বামীজি বিশেষ আনন্দিত হলেন, প্রীত হলেন।

এদিকে, তাঁর পেঁাছাসংবাদ অচিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, গুণগ্রাহী বন্ধুজন ও শিষ্য-শিষ্যার অবিশ্রাম গমনাগমনে উৎসব-মুখর হয়ে উঠল কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে লাগল আমন্ত্রণ—বক্তৃতার জন্য, ভাষণের জন্য।...

সবদিকেই অনুকূল পরিবেশ—প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, উৎসুক, জিজ্ঞাসু নর-নারীর সমাবেশ। স্বামীজিও দেখতে দেখতে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে গেলেন কর্মে। কিন্তু তথাপি.—সেদিনে আর এদিনে কতই না প্রভেদ! সেদিনের বিবেকানন্দ আর আজকের বিবেকানন্দ—একব্যক্তিই যেন নয়। বাহ্যদৃষ্টিতে অবশ্য সহসা কিছু বোঝা যায় না, উপলব্ধিও করা যায়না সহজে—কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, স্পষ্ট দেখা যায়—কত অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত এখন স্বামীজি...

জগৎরঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রায় সমাপ্ত করে আজ 'ঘরমুখো' বিবেকানন্দ নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র, সাক্ষীমাত্র।

কর্মপ্রবাহ যে কমেছে তা নয়, বরং বহুধা বর্ধিত হয়েছে,—কিন্তু কর্মের ডাক আর এখন বিশেষ উচ্চকিত করে না তাঁকে, কানে এসে পেঁাছায়ই

না সহজে। অন্তরের নিভৃতে বসে কে যেন আজকাল ডাকে, বড় করুণ সুরে মাঝে মাঝেই ডাকে—

'ফিরে চল আপন ঘরে।'

আবার, অনন্তের কোল থেকেও মধ্যে মধ্যে আসে আহ্বান, হাতছানি দিয়ে ডাকার সেই একই ইঙ্গিত—

'ফিরে চল আপন ঘরে।'...

এই সময়, একদিন তাই কথা-প্রসঙ্গে, আত্মগত ভাবেই স্বামী অভেদানন্দকে বলেছিলেন—'দেখ ভাই, আমার মনে হয়, কেবলই মনে হয়—এ-জীবনের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এসেছে। খুব বেশী হলে আর তিনচার বৎসর এ দেহ থাকবে—তার বেশী দিন নয়।'

গুরুভ্রাতা দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন—প্রতিবাদও করেন। বলেন,—'কেন ভাই, তোমার শরীর তো এখন অনেকটা সেরেছে। আর কয়েকমাস এখানে থাকলেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'তুমি আমাকে বুঝতে পারনি ভাই'—মৃদুহাস্যে উত্তর করেন স্বামীজি,—'আমি যেন দিনে দিনে অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র দেহপঞ্জর আর আমার বিরাট সত্ত্বাটিকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না। মনে হয়, আমি যেন ফেটে যাব—চৌচির হয়ে ফেটে যাব।' তথাপি কিন্তু, কর্মপ্রবাহ বাহ্যতঃ একইভাবে চলতে থাকে, একইভাবে প্রসারিত হতে থাকে।

* * * *

নিউইয়র্কে কয়েকদিন বাস করে—সেখান থেকে কালিফোর্নিয়া, কালিফোর্নিয়া থেকে লস্‌এঞ্জেলস্‌ গিয়েছিলেন স্বামীজি।

লস্‌এঞ্জেলসে কেটেছিল তাঁর কয়েকমাস এবং সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে অনেকগুলি বক্তৃতাও প্রদত্ত হয়েছিল। তারপর সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো। সেখানেও কিছু দীর্ঘদিন কাটালেন তিনি এবার এবং কতক-গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ বক্তৃতাও এই সময় প্রদান করলেন শহরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে—

'জগতে বুদ্ধের বাণী',
'জগতে যীশুখৃীস্টের বাণী',

'জগতে মহম্মদের বাণী',
'জগতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী',
'বেদান্তধর্ম কি ভাবীকালের ধর্ম',

—ইত্যাদি অনেকগুলি বক্তৃতা এই সময়ই প্রদত্ত হয়েছিল।

এই সময়ের একটি ছোট ঘটনা এখানে বিবৃত করি।

শহরের কোন একটি ছোট নদীতীরে—একদিন অপরাহ্ণে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন স্বামীজি।

নদীর উপর একটি সাঁকো। বেড়াতে বেড়াতে সেই সাঁকোর উপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন, সাঁকোর উপর থেকে—কয়েকজন যুবক জলের উপর ইতস্ততঃ ভাসমান কতগুলি ডিমের খোসা গুলীবিদ্ধ করবার চেষ্টা করছে—কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেও সফল হতে পারছে না।

অনবরত স্থান-পরিবর্তনশীল খোসাগুলি তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে করে যেন সরে যাচ্ছে। অদূরে দাঁড়িয়ে স্বামীজি দেখছিলেন দৃশ্যটি আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হঠাৎ যুবকদের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে আর তাঁকে হাসতে দেখে—নিতান্ত অপমানিত বোধ করে—তাদের একজন তক্ষুনি গিয়ে চ্যালেঞ্জ করল স্বামীজিকে। বলল,—'আপনিই গুলী করুন দেখি, হাসছেন তো খুব! কিন্তু কাজটা যত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয়।'

স্বামীজি কোন উত্তর না দিয়ে—তাদের একজনের হাত থেকে একটা বন্দুক চেয়ে নিলেন এবং অব্যর্থলক্ষ্যে পর পর দশবারোটি খোসা গুলীবিদ্ধ করে বন্দুকটা তাদের ফিরিয়ে দিলেন। যুবকদল নির্বাক, স্তম্ভিত। তারা স্বামীজিকে একজন অদ্বিতীয় শিকারী বলে স্থির করে নিল। কিন্তু তাদের বিস্ময় বহুগুণ বর্ধিত হল যখন তারা শুনল—স্বামীজি জীবনে সেই প্রথম বন্দুক ধরেছেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তিনি বন্দুক স্পর্শ করেন নি।

কি প্রকারে তবে এ-অসম্ভব সম্ভব হল—তাই জানবার জন্য যুবকদল অবশেষে প্রশ্ন করল স্বামীজিকে।

চলতে চলতে স্বামীজি শুধু বললেন—'চিত্তের একাগ্রতায় ও মনঃসংযমে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে।'

* * * *

এই কালিফোর্ণিয়া ও সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বাস কালেই স্বামীজির অন্যতম শিষ্যা—মিস্‌ মিন্নি বুক্‌—ধ্যান-তপস্যার উপযোগী একটি নিভৃত-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য লোকালয় থেকে বহুদূরে বিরাট এক ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন। একশতষাট একর পরিমিত সেই ভূখণ্ডেই, অরণ্যানী পরিবৃত নিসর্গের সেই রম্যনিকেতনেই স্থাপিত হয়েছিল—অধুনাখ্যাত 'শান্তিআশ্রম', *'Peace Retreat.'*

স্বামীজি স্বচক্ষে সে-স্থানটি দেখবার সুযোগ পান নি,—কিন্তু সে-স্থানের একান্ত শান্ত বিজনতার বিবরণ শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। গুরু-ভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে সে আশ্রমের ভার প্রদান করে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেছিলেন —

'যাও ভাই, শান্তি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর গে। বেদান্তের বিজয়-কেতন উড্ডীন কর গে। নিজের কথা ভুলে যাও, দেশের কথা ভুলে যাও।' তারপর নিজের জীবন-পুঁথির একটি পংক্তি উধৃত করেই যেন বলেছিলেন—সর্বোপরি, *'Live the life...Live the life and the Mother will see to the rest.'*

বস্তুতঃ, স্বামীজির সমগ্র জীবনবেদ পর্যালোচনায় এই কথাটিই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাস যুগপৎ চিরদিন অব্যর্থ নির্দেশে তাঁর জীবন নিয়মিত করে এসেছে। আবার, ইদানীং ব্রত-উদ্‌যাপিত-জীবনা-পরাহ্নে সে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেন অপূর্ব গভীরতা ও সর্বাবয়বতা লাভ করেছিল। তাঁর সহজাত অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যে তাতে কিছুমাত্র হ্রাস হয়েছিল তা নয়। ইচ্ছামত বিরাট ব্যক্তিত্বের অনতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার ক'রে—নেত্রকোণ থেকে বহ্নিকণা বিনির্গত করে বিরুদ্ধ শক্তিকে মুহূর্তে মলিন করে দেবার অমিত-শক্তিতে পূর্বেরই মত তিনি শক্তিমান ছিলেন। যুক্তি-বিস্তারে এখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তপস্যা দীপ্তিতে অতুলনীয়-ভাস্বর।

কিন্তু তথাপি অন্তরে অন্তরে ভাবের ফল্গুপ্রবাহে এখন তিনি একেবারে উদাসীন, মহামায়ার মহতী ইচ্ছাস্রোতে একান্তভাবে ভাসমান।

সমস্ত শাস্ত্রতর্কের, কর্ম-কোলাহলের তরঙ্গবিক্ষেপ স্তব্ধ করে মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে সেই বহুদিন-বিগত যৌবন-প্রত্যূষের দিনগুলির কথা,—

দক্ষিণেশ্বরের দেবদেউলে, পুণ্যতোয়া সুরধুনীর তীরে—শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে ধ্যান-তপস্যার অব্যাহত আনন্দধারায় কেটেছিল যে মধুময় দিনগুলি—সেই দিনগুলির কথা।

কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করে, দেহবন্ধন ছিন্ন করে—নিস্তরঙ্গ সমাধি সায়রে ডুব দেবার জন্য তাই তিনি বিশেষ উন্মুখ হয়েছিলেন এইকালে...

'A longing for the Absolute, longing to break all bounds and fly into the Highest'— এই ছিল তাঁর এ-সময়কার মনোভাব।

তাই দেখি, এই কালিফোর্ণিয়া বাসের নিরতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেই যখন বহু প্রতিষ্ঠান...দেশ-বিদেশের কেন্দ্রগুলির বহুমুখী সমস্যা, অসংখ্য নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিলতা তাঁকে একান্তভাবে কর্মে লিপ্ত করে রেখেছে তখনই অন্তরজীবনের তদানীন্তন অবস্থার সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে জনৈকা শিষ্যস্থানীয়াকে তিনি লিখছেন,

'কর্ম করা কঠিন...সব সময়ই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা করো যেন চিরদিনের মত আমার কর্ম শেষ হয়ে যায়।...

আমি ভাল আছি। মনের দিক দিয়ে খুবই ভাল আছি। শরীরের চাইতে মনের স্বাচ্ছন্দ্যই অধিক বোধ কচ্ছি।...

লড়াইয়ে হারজিত দুই-ই হ'ল, এখন সেই মহান-মুক্তিদাতার অপেক্ষায় আমি পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে বসে আছি।

অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।...

জীবনের প্রভাতকালে একদা যে-একটি মুগ্ধমতি বালক—দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অপূর্ব বাণী শুনতে শুনতে অবাক হত, তন্ময় হয়ে যেত—সেই বালক-ভাবটিই আমার যথার্থস্বরূপ, যথার্থ পরিচয়।

আর কাজকর্ম, ভালমন্দ যা-কিছু করা গেছে...সে-সব তারি উপর আরোপিত কতকগুলি উপাধিমাত্র।

আবার এখন আমি সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই পুরাতন ও পরিচিত কণ্ঠস্বর...যাতে আমার অন্তঃস্থল পর্যন্ত কণ্টকিত হচ্ছে, বন্ধন খসে যাচ্ছে...কর্মকোলাহল বিস্বাদ বোধ হচ্ছে, জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ বিলুপ্ত হচ্ছে।

ঐ, ঐ তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি...মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে... সংসারের ভাল-মন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুকগে—তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।...

যাই—প্রভু, যাই!

ঐ নির্বাণের মহাসমুদ্র আমি সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি—তরঙ্গহীন, ঊর্মিহীন, প্রশান্ত সে মহাপারাবার।

আমি যে জন্মেছিলুম—তার জন্য আমি খুশী আছি। এ-জীবনে যে বহু দুঃখভোগ করেছি, বহু ভুল-ভ্রান্তি করে বসেছি তার জন্যও খুশী আছি—আবার এখন যে নির্বাণের মহাসমুদ্রে ডুব দিতে চলেছি—তাতেও খুশী আছি।

কোন বন্ধন নিয়ে এ সংসারে আমি আসি নি, কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি আসুক—অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই।

পুরানা বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে—আর ফিরছে না।

শিক্ষাদাতা ও গুরু বিবেকানন্দ, নেতা ও আচার্য বিবেকানন্দ সরে গিয়ে পূর্বেকার সেই বালক, প্রভুর সেই চরণাশ্রিত দাস আবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

পূর্বে আমার কর্মের পশ্চাতে উচ্চাভিলাষ থাকত—পবিত্রতার পশ্চাতে শঙ্কার ভাব থাকত—শিক্ষাদানের পশ্চাতেও বোধ করি বা কর্তৃত্বের ছোঁয়াচ থাকত...আজ সে-সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে...আর আমি ভেসে চলেছি কালের নিস্তরঙ্গ, শান্ত প্রবাহে—নিশ্চেষ্ট হয়ে, হাত-পা একেবারে ছেড়ে দিয়ে।

যাই মা, যাই!...

সকল কর্তৃত্ব বিসর্জন দিয়ে—অভিনেতার সকল ভূমিকা পরিত্যাগ করে

দ্রষ্টারূপে, সাক্ষীরূপে,—যেখানে তুমি নিয়ে যাবে—শব্দহীন, সীমাহীন সেই রহস্যময় প্রদেশে তোমার স্নেহময় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর আমার কোন দ্বিধা নেই।...শান্তি, কেবল শান্তি!...সর্ব চরাচর ব্যাপ্ত করে প্রশান্ত আনন্দের ধারা কী অব্যাহত স্রোতে বহমান! চিন্তাগুলি যে মনে উদিত হচ্ছে তাও যেন কোন্ দূর দূরান্ত থেকে, অন্তরের কোন্ গভীর নিভৃত প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ, অস্পষ্ট ধ্বনির মত ভেসে আসছে।

চারদিকে যা-কিছু দেখছি—সবই যেন প্রাণহীন, ছায়ার মত মনে হচ্ছে। নিদ্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তটিতে—মানুষ যেমন অনুভব করে—জীবনও নয়, মৃত্যুও নয়—অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটা অবস্থা...ঠিক তেমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি ভেসে চলেছি।'...

এমনি একখানা নয়, দু'খানা নয়...খুঁজে বের করলে দেখা যাবে অনেক অক্ষয়-লিপির ভাষাবন্ধনে একালের অন্তরজীবনের আংশিক পরিচয়কে তিনি এইভাবে সীমাবদ্ধ করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য।...এবং শুধু চিঠির মধ্য দিয়েই নয়—তাঁর এই কালের বক্তৃতা, ক্লাস প্রভৃতি সব কিছুরই ভিতর দিয়ে সেই একই সুর ধ্বনিত...

'মন চল নিজ নিকেতনে।'

সকল বন্ধন চূর্ণ করে—ভূমার বাধাহীন, দ্বিধাহীন, অন্তহীন আনন্দ-সায়রে ঝাঁপিয়ে পড়, অবগাহন কর, মগ্ন হও। পিছনের দিকে তাকিও না, অনুশোচনা করো না। অনন্তজীবনের তোমরা অধিকারী, হে অমৃতের সন্তানগণ!'—

'Don't repent, Don't repent!
Spit, if you must, but go on!

Throw off the load of sin, if there is such a thing—by knowing your true selves;—*The Pure, the Ever Free!* That man is blasphemous who tells you that you are sinners,'...

ইহা ছাড়া ইদানীং আবার বক্তৃতার শেষে প্রায়ই প্রশ্ন আহ্বান করতেন

স্বামীজি এবং প্রশ্নোত্তর শেষ হলে,—কখনো কখনো অনুরাগী শিক্ষার্থীদের কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেবার জন্য—ক্লাস-ঘরেই পদ্মাসনে ধ্যানে বসে পড়তেন তিনি এবং শিক্ষার্থীদেরও তাঁর সঙ্গে বসে ধ্যানাভ্যাস করতে নির্দেশ দিতেন।

দুর্লভ, সুদুর্লভ সে-সব মুহূর্তগুলি!

ভাগ্যবান বহু নরনারীর জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মত যেন স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ত তারা।

স্বামীজি ধ্যানে বসতেন আর মুহূর্তে—শান্ত, স্তব্ধ পরিবেশে গৃহের অভ্যন্তর দেবভূমিতে পরিণত হত। একটা দিব্য আবেশে গম্‌গম্‌ করত আকাশ-বাতাস।

গৈরিক পরিহিত, গৈরেক শিরস্ত্রাণ-শোভিত—অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু,—নিবাত নিষ্কম্প, ব্রহ্মলীন স্বামীজি প্রস্তর মূর্তির মতই তখন প্রতিভাত হতেন।

সেই ধ্যান-মূর্তির প্রতিচ্ছবি—আজ শুধু বর্ণচিত্রে আর মসী-লিপির বর্ণনায় ছাড়া অন্য কোন সূত্রে চর্মচক্ষে দেখতে পাবার আমাদের পথ নেই।...

'Seated cross-legged on divan, clothed in his Sannyasin garb, with hands held one within the other in his lap and with his eyes apparently closed, he might have been a statue in bronze, so immovable was he. A Yogi, indeed! Awake only to transcendental thoughts'—

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুঁত বর্ণনা এটি।

এইটিরই অক্ষয়স্মৃতি পশ্চাতে রেখে—তাঁর জীবনের প্রথম কর্মস্থল, বর্তমানযুগে বহির্ভারতে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম প্রচারস্থল—নূতন গোলার্ধের তটভূমি ত্যাগ করে—আমরা বিদায় হলাম।

বিদায় হলাম সেই দিন,—সন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই—যেদিন আমেরিকা ত্যাগ করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে পুনঃ যাত্রা করেছিলেন স্বামীজি।...

বস্তুতঃ, আমেরিকার বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষতা থেকে সেই তাঁর শেষ বিদায়, ইহজীবনে আর সেদেশে তাঁর যাওয়া ঘটেনি।

আজ তাঁর দেহত্যাগের কত বৎসর পরে—সে-মহাদেশকে আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি—যে-দেশ প্রথম চিনেছিল ও অভিনন্দিত করেছিল স্বামীজিকে, প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করেছিল তাঁর সম্মুখে।

আর প্রণাম করি সেই পুণ্যশ্লোক মনীষীকে—যাঁর প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে, সাধনায় ও প্রযত্নে—বহুকালের ভ্রষ্ট-গৌরব, লুপ্ত-মর্যাদা ভারতবর্ষ, পুনর্বার সমাদৃত হয়েছিল বিশ্বের দরবারে।

ছন্দ-মালিকা রচনা করে বলি,—

তুমি মহা-প্রাণ বিবেকানন্দ
চিরযৌবন, মৃত্যুজয়ী,
গত-অনাগত মিশেছে তোমাতে
তুমি কালাতীত সত্যাশ্রয়ী।
নিত্যমুক্ত, সন্ন্যাসী তুমি
নিষ্কাম যতি, সিদ্ধধ্যানী,
আর্তজনের অশ্রু মোছাতে
বহিয়াছ শিরে ব্যথার গ্লানি।
শ্রীরামকৃষ্ণ-সুত তুমি প্রভু,
এ-যুগের নব-বার্তাবহ।
শক্তিমন্ত্রে এনেছ চেতনা—
জাতির শ্রদ্ধা, প্রণতি লহ।

* * * *

১লা আগস্ট, সন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ।

২০শে জুলাই, আমেরিকা ত্যাগ করে—ঐদিন তিনি পেঁাছেছিলেন ফরাসীর রাজধানী নগরী-প্রধানা পারীতে।

পারীতে তখন আহূত হয়েছে বিশ্ব-ধর্ম-ইতিহাসের এক সম্মেলন—Congress of the History of Religions.

মুখ্যতঃ, সেই সম্মেলনে যোগ দিতেই অবশ্য তিনি গিয়েছিলেন পারীতে—কিন্তু তাঁর তিন-চার মাসের পারী অবস্থান কালে তত্রত্য বহু খ্যাতনামা মনীষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। শিক্ষায়, বিজ্ঞানে—

শিল্পে, সাহিত্যে যাঁরা ফরাসী সমাজের মুকুটমণি তাঁদের অনেকের সঙ্গে প্রভূত ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল এই কালে।

তারপর অক্টোবর মাসের শেষদিকে—প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়িকা মাদাম কাল্‌ভের অতিথিরূপে কতিপয় বন্ধু ও শিষ্য-শিষ্যা সমভিব্যাহারে মিশরাভিমুখে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

পথে ভিয়েনা, কনস্টাণ্টিনোপল্‌, স্কুটারি প্রভৃতিও পরিদর্শন করেছিলেন এ যাত্রায়।...

তারপরই মিশর।...

যে-মিশরের প্রান্ত দিয়ে অল্পদিন পূর্বেই জলপথে তিনি ইউরোপ গিয়েছিলেন আজ তার বহুপুরাতন-স্মৃতিবিজড়িত বক্ষে পদার্পণ করে—প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল স্বামীজির।

কত যুগ, কত শতাব্দী, কত মন্বন্তরের রূপকথার কাহিনী সে-সব। একদা পার্থিব সম্পদ ও শক্তির একচ্ছত্রাধিপতিরূপে,—অখণ্ড প্রতাপে যারা সে দেশের মাটিতে রাজত্ব করত—মৃত্যুর পরও অমর থাকবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার যাদের অবধি ছিল না—আজ সর্বগ্রাসী মহাকাল তাদের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করছে, নিঃশেষ করছে!

শুধু বিগত দিবসের মূক্ সাক্ষীস্বরূপ—মিশরের মহাশ্মশানে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে—বিশালকায় পিরামিডগুলো, স্ফিংক্সগুলো, আর কাইরোর সংগ্রহশালার বিচিত্র স্মৃতিচিহ্নগুলো।

স্বামীজির একান্ত অন্তর্মুখী উদাস-মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এরা। এদের দেখতে দেখতে অন্তরের অবচেতনে প্রবেশ করে জীবনের শেষ পৃষ্ঠাগুলি শেষবারের মত উল্টিয়েছিলেন স্বামীজি। নীল নদের তটভূমির অবর্ণনীয় নৈসর্গিক মাধুর্যও যেন তাঁকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারেনি। তাঁর সহযাত্রীদের অন্যতম লিখেছিলেন—

In Paris, often-times his mind had been far aloof from his environment; and here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience.

নিরবচ্ছিন্ন একটা চিন্তাধারা, অব্যাহত একটা ধ্যানতন্ময়তা এ-সময় তাঁকে যেন এককালে আচ্ছন্ন করেছিল।

And who was with him at the time said :
'How tired and world-weary he seemed !'

* * * *

মিশরে অবস্থানের কয়েকদিন মাত্র পরেই সহসা একদিন মাতৃভূমির আহ্বান যেন তাঁর কানে পেঁছাল এবং কিছুমাত্র বিলম্ব না করে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে ফিরবার সংকল্প করেছিলেন স্বামীজি।

তারপর সহযাত্রী সবাইকে আশীর্বাদ করে,—জীবনের শেষবারের মত আশীর্বাদ করে, প্রথম-প্রাপ্ত জাহাজেই ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন তিনি। পথে আর কোথাও বিলম্ব করেননি, পূর্বাহ্ণে কাউকে কোন সংবাদও দেননি। একেবারে সোজা মিশর থেকে বোম্বাই হয়ে দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে—৯ই ডিসেম্বর, অনেক রাত্রে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করেছিলেন স্বামীজি!

বিপুল আনন্দ-কোলাহলে মঠবাসীরা বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিল সেদিন। কিন্তু সে কাহিনী এখন থাক।...

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ বিরাট জীবনের চরম অধ্যায়ে এসে এইখানে এ পর্যায় শেষ করছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে তাঁর যে ভ্রমণ-কাহিনী এ পর্যায়ে অতি-সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করলাম তার ভিতর দিয়ে সে অলোক-অধ্যাত্ম প্রকৃতির কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে—মোটেই কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিনা—জানি না।

পূর্বদিগন্তে উদয়-উন্মুখ সূর্যের যে কনক-কিরণ দিবারম্ভে ধরিত্রীর বুকে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ে—পশ্চিম দিগন্তের অস্তাচলশায়ী সূর্যরশ্মির সঙ্গে তার প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। প্রদীপ্ত সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান স্বামী বিবেকানন্দের জয়যাত্রার পথের উদয়াচল এবং অস্তাচলেও ঠিক সেই পার্থক্যই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল এবং সেই কথাটিই এ পর্যায়ে আমরা

বলতে চেষ্টা করেছি। প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি, ঘটনার পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে, ভগিনী নিবেদিতার সেই উক্তিটি...

The outstanding impression made by the Swami's bearing during all these months of European and American life—was one of complete indifference to his surroundings...

Both victory and defeat would come and go. He was their witness...

অন্তর-বাহিরের এই দুই গতিস্রোতের মধ্যে শুধু একটি ধারা ছিল নিত্য অব্যাহত, একটি কামনা ছিল অচঞ্চল দীপশিখার মত নিত্য ঊর্ধ্বমুখে দীপ্যমান.—কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক পৃথিবীর, সম্পদ-সচ্ছলতায় পূর্ণা হোক জীবধাত্রী বসুধা, নিরাময় হোক, আধিহীন, ব্যাধিহীন হোক মানব-সমাজ...

'কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী
দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়া।'

শেষ পর্যায়

বেলুড় মঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্থি-পূত গঙ্গাতীরের নিজস্ব মঠবাটী।

বহুদিন পর পুনর্বার—নিজ হাতে গড়া সেই মঠে প্রত্যাবর্তন করে—ক্লান্তদেহ স্বামীজি বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিলেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন। কিন্তু সতের আঠার দিন মাত্র মঠে যাপন করেই তাঁকে এবার বিশেষ কারণে যাত্রা করতে হয়েছিল হিমালয়ের দিকে।

মিশরে অবস্থান কালের একেবারে শেষদিকে—তাঁর মনে যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস জেগেছিল। যাকে প্রিমনিশন্ বলে ইংরেজীতে, তারই প্রভাবে যেন তিনি জানতে পেরেছিলেন—তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ সেভিয়ার আর বেঁচে নেই।

মঠে এসে জানলেন তাঁর প্রিমনিশন্ মিথ্যা নয়। মিঃ সেভিয়ার সত্যই দেহরক্ষা করেছেন। সুতরাং তদীয় বৃদ্ধা পত্নীকে দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে একবার মায়াবতী যাবার জন্য ব্যগ্র হলেন স্বামিজী এবং সেই জন্যই—আঠার দিন মাত্র মঠে যাপন করেই এবার মায়াবতীর উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন।

* * * *

সন ১৯০০—১৯০১ খৃীস্টাব্দ। অতি প্রচণ্ড তীব্রতায় শীত নেমেছিল সে বৎসর হিমালয়ে। ধোনা তুলার মত পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেত তুষাররাশিতে এককালে আবৃত হয়েছিল মায়াবতীর পর্বতগাত্র ও সানুদেশ। সেই অকলঙ্ক তুষারের দেশে—মায়াবতী আশ্রমের একান্ত নির্জন এবং ধ্যানতপস্যার পরমোপযোগী নিজস্ব বাটী দেখে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলেন স্বামীজি।

উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত অভিলাষী যারা, বেদান্ত সাধনার যথার্থ অধিকারী যারা—তাদের জন্য সর্বাংশে অদ্বৈত-ভাবপুষ্ট সে আশ্রমটি তাঁর যেন ঠিক মনের মতনটি হয়েছিল। অতি অল্পকয়েকদিনই অবশ্য তিনি সেখানে থাকতে পেরেছিলেন সেবার। কিন্তু সেই অত্যল্পকাল মধ্যেই পার্শ্ব-

বর্তীস্থানসমূহের বহু ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভে ধন্য হয়েছিল। নির্জন মায়াবতী আশ্রম তাঁকে পেয়ে যেন সজীব হয়ে উঠেছিল, মুখর হয়ে উঠেছিল।

আশ্রমের অনতিদূরে—ক্ষুদ্র হ্রদাকৃতি জলাশয় ছিল একটি। তারি পাশ দিয়ে নিস্তব্ধ প্রভাত-সন্ধ্যায় মিসেস্ সেভিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। সেই ভ্রমণকালে একদিন সেভিয়ার-পত্নীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন...

'জীবনের শেষদিকে কর্ম-কোলাহল একেবারে বর্জন ক'রে—এই হ্রদের তীরে সম্পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন করব আমি। কোন কাজ নয়, কোন হৈ-চৈ নয়, কেবল আপন মনে গ্রন্থরচনা...আর বনচারী পাখীর মত খেয়াল-খুশীতে গান গেয়ে বেড়ান—এই হবে আমার কাজ।'

কিন্তু মায়াবতীর তীব্র শীত ও পাহাড়ের অতি-উচ্চতা তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যে সহ্য হ'ল না। অল্প কয়েকদিন পরই মায়াবতী ত্যাগ করে নিম্ন সমতলে নেমে আসতে তিনি বাধ্য হলেন। মায়াবতী থেকে টনক্পুর হয়ে পিল্‌বিট এবং পিল্‌বিট থেকে একেবারে সরাসরি কল্‌কাতা চলে আসলেন স্বামীজি—পথে আর কোথাও থামলেন না, কোথাও অপেক্ষা করলেন না।...

পিল্‌বিটের পথের একদিনের কথা!

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত, অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজি।

বলেছিলেন,—'জীবনে বহুবার, বহুরূপে যাচাই করে দেখেছি, বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করে দেখেছি—কী সুদূরদর্শী যে ছিল তাঁর দৃষ্টি, কী অব্যর্থ ও নির্ঘাত যে-ছিল তাঁর উক্তি—তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর ছোট বড় সকল কথা, সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে!'

ভাব-ভক্তির আবেগে এই সময় নিজের সম্বন্ধেও দু'একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি নির্গত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে—হয়ত বা অনবধানতা বশতঃই—কারণ নিজের কথা ক্বচিৎ তাঁর কণ্ঠ থেকে বহির্গত হত।...

'আমার এ ক্ষুদ্রজীবনে যথাসাধ্য তাঁর কাজ করতে আমি চেষ্টা করেছি,

আলস্য করিনি, বিশ্রাম করিনি। নিন্দাস্তুতি তুচ্ছ ক'রে পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করতে প্রাণপণ করেছি আমি—'

Above all, above all...I am loyal! I am loyal to the core of my heart!...এমনি ধরণের কথা।

* * * *

মায়াবতী থেকে বেলুড় প্রত্যাবর্তন করে—জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন মোটের উপর তিনি মঠেই যাপন করেছিলেন। অর্থাৎ, ১৯০১ খৃীস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল যে সময় তার অধিকাংশ তিনি মঠেই অতিবাহিত করেছিলেন।

অব্যাহত, একটানা অবশ্য নয়। কারণ, মধ্যে দু'তিনবার তাঁকে এদিক-ওদিক যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব বেশী দিনের জন্য নয়।

কী সরল, অনাড়ম্বর—প্লেইন্ লিভিং ও হাইথিংকিং-এর জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ, একেবারে নগ্ন শিশুর মত জীবন যে একালে তিনি যাপন করতেন মঠে তা বলবার নয়!

তাঁর জীবনচরিতকারগণ এবং ভগিনী নিবেদিতা, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যাগণ সে-জীবনের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

* * * *

কখনো নগ্নপদে, সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে...ধরিত্রীর ধূলির উপর বসে সাঁওতাল দিন-মজুরদের ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে জগতের সব কিছু তিনি বিস্মৃত হতেন। কখনো-বা আশ্রম-পালিত ছাগ-শিশু, হরিণশিশু, বাঘাকুকুর প্রভৃতির সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটিতে মত্ত হয়ে বালকের মত উল্লসিত হতেন।

কত কীর্তিমান পণ্ডিতজন, কত ধনকুবের, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কত মনীষী বিশ্ববিজয়ী, বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেখতে এসে এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্মিত হত।

কখনো আবার, গুরুভাইদের ও নবাগত সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে রজনীর শেষ যামে তিনি ধ্যানে বসতেন। সুষুপ্ত ধরণীর বুকে...নবযুগের ঋত্বিকগণ যেন অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—জীবনোৎ-

সর্গ করবার সংকল্প নূতন করে গ্রহণ করত। আর সেই সময়, নির্মেঘ আকাশগাত্র থেকে মন্দার-কুসুমের ঝরে-পড়া পাপড়ির মতো প্রসন্ন সূর্যের রশ্মিধারা, 'প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ' সেই ত্যাগদীপ্ত জীবনগুলিকে আশিস-স্পর্শ দান করে যেত।

কখনো কখনো, ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে তিনি তৎপর হতেন। বেদ-উপনিষদের অধ্যয়ন ও আলোচনায় দেশবাসীকে আগ্রহ-শীল ও উদ্যমশীল করবার তাঁর আজীবনের যে-আকাঙ্ক্ষা তা যেন এইকালে প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়েছিল।

'A Vedic Institution to train teachers and preserve Aryan culture and Sanskrit learning'—তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক এ-অভিপ্রায় বিশেষরূপে প্রকট হয়েছিল এইকালে। কিন্তু তথাপি, এইসব বেদ-বিদ্যালোচনার কালেও কখনো কখনো এমন অবস্থার উদ্ভব হত—যখন মরজগতের দুঃখ-বেদনার কোন মর্মন্তুদ কাহিনী—মুহূর্তে মায়াতীত ভূমি থেকে বেদান্তসিদ্ধ বিবেকানন্দকে টেনে আনত জীবধাত্রী এই ধরিত্রীর বুকে, বিশাল হৃদয়ের অনুপম সহৃদয়তার অন্তরালে মুহূর্তে অবলুপ্ত হত সকল বুদ্ধি-বিচার। দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় নির্গত হত করুণার তপ্ত বারিধারা।...

গল্প নয়, কল্পনার তৈরী কাহিনী নয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা এসব—মুহুর্মুহুঃ সংঘটিত হয়েছে স্বামীজির জীবনে একালে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

সেদিন অপরাহ্ণে ঋক্‌বেদ-সংহিতার এক জটিল সূত্র ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজি। মঠের আব্‌হাওয়া উচ্চ জ্ঞানালোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল। এমন সময় প্রসিদ্ধ নাট্যকার,—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হলেন মঠে। স্বামীজিকে শাস্ত্রালোচনায় নিরত দেখে গিরিশবাবু নীরবে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন।...

স্বামীজি রহস্য করে বললেন,—'কি জি. সি! এসব অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ তো আলোচনা করে দেখলে না কখনো!' কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে প্রত্যুৎ-পন্নমতি গিরিশবাবু উত্তর করলেন—'না ভাই! ওসব এজন্মে আর হল না।

এবার 'জয় রামকৃষ্ণ' বলেই পাড়ি জমাতে হবে। ওসব তোমার জন্য। কিন্তু একটা কথা ভাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। বেদ-বেদান্ত তো তুমি যথেষ্ট আলোচনা করেছ, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করতলগত। কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর করবার, তার চোখের জল মোছাবার কোন পন্থা কি ঐ গ্রন্থে তুমি খুঁজে পেয়েছ?

এই-যে কলকাতায় দেখতে পাই...আজ যার বাড়ীতে পঞ্চাশখানা পাতা পড়ে, উৎসব-কোলাহলে মুখরিত থাকে প্রাঙ্গন...কাল উপার্জনক্ষম গৃহকর্তাটি যেই চোখ বুজল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-বাড়ীতে অন্নের হাহাকার! পেট ভরে দু' মুঠো খেতে পায় না, এক টুক্রো জীর্ণ বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করবার জন্য সংগ্রহ করতে পারে না, মাথা গুঁজবার একটু কুঁড়ে নেই।...

দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, ব্যাধিতে—ক্লিষ্ট, জীর্ণ অসংখ্য নরনারীর অপরিমেয় চিরন্তন বেদনা,...তা দূর করবার কোন পথ কি তোমার বেদ-বেদান্তের পাতায় লেখা অছে?'

গিরিশবাবুর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সেই বেদনা-বিদ্ধ উক্তিগুলি মুহূর্তে যেন সকলের অন্তরে গিয়ে সকরুণ আঘাত করল। বেদনার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল থম্‌থম্‌ রক্তিম হয়ে উঠল। চোখের জল গোপন করবার জন্য তিনি অতি দ্রুত উঠে চলে গেলেন কক্ষ থেকে।...

স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে আর সবাই বসে রইল। একটু পরে ধীরে ধীরে সকলকে সম্বোধন করে বললেন গিরিশবাবু, 'দেখ, এই যে বিশাল প্রাণ, এই যে সীমাহীন্ সমবেদনা...দুঃস্থের দুঃখ-কাহিনী শুনবার সঙ্গে সঙ্গে বেদ-বেদান্ত তুচ্ছ করে—ঐ যে চোখের জল গোপন করবার জন্য উঠে চলে গেল... ঐ জন্য, বিশেষ করে ঐ জন্য,—তোমাদের স্বামীজিকে এত শ্রাদ্ধ করি, এত ভালবাসি!

শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য—এসব দুর্লভ হতে পারে—কিন্তু সুদুর্লভ এ হৃদয়-বত্তা!...

এ জীবনে এমনটি আর কৈ?—মানুষ তো কম দেখলাম না।'...

* * * *

এমনিভাবে, স্বামীজিকে কেন্দ্রে নিয়ে আনন্দের জীবন, তপস্যার জীবন—কর্ম ও জ্ঞানোৎকর্ষের জীবন—অব্যাহত অগ্রসর হচ্ছিল মঠে। মঠের সেই গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকতা, গঙ্গার পূত শীকরসিক্ত শীতল বাতাস,...নিজের সেই শান্ত, নাতিবৃহৎ ঘরটি, সর্বোপরি দিনে দিনে উৎসাহীমন ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কর্মীদের আগমন...মঠ-বাটীকে অত্যন্ত প্রিয় করেছিল স্বামীজির কাছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য নরনারী তখন প্রতিদিন তাঁর কাছে আসতো—উপদেশের জন্য, নির্দেশের জন্য, আশীর্বাদের জন্য।

আর স্বামীজি? স্বামিজী প্রফুল্ল অন্তরে—শারীরিক আধি-ব্যাধির কথা একেবারে তুচ্ছ ক'রে—তাদের তৃপ্ত করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন, প্রেরণা দিতেন—উচ্চ জীবন লাভের জন্য, প্রেয়কে বর্জন করে—শ্রেয়কে গ্রহণ করবার জন্য। বলতেন, *Work is my weak point*—কর্মই আমার দুর্বলতা!...

তথাপি কিন্তু, এ-কালের স্বামীজির জীবনের ইতিহাস—মুখ্যতঃ তদীয় আন্তব জীবনেরই ইতিহাস। কর্ম অন্তে, দিনের শেষে,—'আপন ঘর' অভিমুখে নিঃশব্দ পদচালনারই অলিখিত সে ইতিহাস।

বাহ্যিক ঘটনানিচয়ের কোন ইতিহাস নয়, কর্মের বহির্মুখী আহ্বানের ইতিহাসও নয়—পরন্তু. মহামায়ার মহতী ইচ্ছাস্রোতে গা-ভাসান দিয়ে তাঁরই বক্ষে শেষ-বিশ্রাম লাভের জন্য অনিবার্য অথচ অলক্ষিত গতিতে পথ চলারই সে অবর্ণনীয় ইতিহাস।

মঠ-বাটী ছেড়ে অধুনা তাই কোথাও তিনি বড় একটা যেতে চাইতেন না। গেলেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মঠে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। তাই দেখি, মঠ-জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি পত্রে—ঠিক এই সময় না হলেও—একালেরই কাছাকাছি সময়ে তিনি জনৈক মার্কিন শিষ্যাকে লিখেছিলেন...

Verily, I am a bird of passage! Gay and busy Paris, grim old Constantinople, sparkling little Athens and Pyramidal Cairo are left behind...and here I am now, writing in my room in the Math on the Ganges...

It is so quiet and still. Everything is green and gold...and the air is cold and crisp and delightful.

তথাপি এ কথা বলতে হবে যে—এর মধ্যেও কর্মের আহ্বান তাঁকে মাঝে মাঝেই বাইরে নিয়ে যেত।—তিনি না গিয়ে থাকতে পারতেন না। কারণ, *Work was his weak point....*

বস্তুতঃ মায়াবতী থেকে ফিরে এসে—তিন চার সপ্তাহ মধ্যেই—পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে একবার যেতে হয়েছিল তাঁকে। আবার জীবনের শেষ-ভাগে, দেহত্যাগের কয়েক মাস মাত্র পূর্বে কাশীধাম ও বুদ্ধগয়া দর্শনেও গমন করেছিলেন স্বামীজি। কিন্তু সেকথা পরে বলব।...

এখানে শুধু এই কথাটি বলি যে, যে জগৎ-নিয়ামক মহাশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কালী' নামে অভিহিত করতেন,—সেই শক্তিই এখনো তাঁকে কর্ম থেকে কর্মান্তরে টেনে নিয়ে যেত, পূর্ণ বিশ্রাম দিতে চাইত না।

সর্বোপরি ভারতবর্ষ, তাঁর স্বপ্নের সোনার ভারতবর্ষ, *Queen of his adoration* যে-ভারতবর্ষ—তারি কথা, তারি চিন্তা—শত গভীর অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যেও মৃত্যুর জন্য সর্বথা প্রস্তুত হয়েও যেন তিনি ভুলতে পারতেন না। তরুণ শিষ্যদের উদ্দেশ করে প্রায়ই তাই তাঁকে বলতে শোনা যেত,—'তোদের এত ভালবাসি তবু মনে হয় দেশের জন্য খেটে খেটে তোরা মরে যা আমি দেখে খুশি হই।'

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে বলব। সেটি মঠের প্রথম আনুষ্ঠানিক দুর্গোৎসব।

বিলাতফেরত স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত আশ্রম...

সকল ভাবের, সকল মতের মিলনক্ষেত্র—রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন। গোঁড়ামি নেই, সংকীর্ণতা নেই। মানুষ মাত্রেরই জন্য সে দেব-দেউল সদা মুক্ত রেখেছে তার দ্বার।

কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, কূপমণ্ডুক হিন্দুসমাজ আর তার গোঁড়া চাঁই-এর দল অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সেজন্য। কুৎসায়, নিন্দায় তখন তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

মঠের যদৃচ্ছা নিন্দা করতে—এমন কি, স্বামীজির অকলঙ্ক স্ফটিক-স্বচ্ছ দেব-চরিত্রে কলঙ্কলেপন করতেও তারা পশ্চাৎপদ হয়নি।

পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ অবশ্য কিছুমাত্র গ্রাহ্য করতেন না সেজন্য। কখনো দৃপ্তকণ্ঠে বলতেন—'হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুখে হাজার'; আবার কখনো একটু নরম হয়ে—শিষ্যদের ও গুরুভাইদের উদ্দেশ্য করেই হয়ত বলতেন—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

বলতেন, 'কালে এ সব তুচ্ছ নিন্দা-কুৎসা নীরব হয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক'; সেই পোকসদৃশ লোকের কথায় বেশী কান দিলে চলবে কেন?

নিঃস্বার্থ হয়ে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে যাও... 'Victory is sure to come.'...

বস্তুতঃ, হয়েছিলও তাই।

ধীরে ধীরে বিরুদ্ধবাদীর দল স্তব্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে বহু 'সল', —'পলে' পরিণত হয়েছিল, স্বামীজির জীবদ্দশায়ই এবং একথাও অনেকে মনে করেন যে,—মঠের সেই প্রথমবারের সর্বাঙ্গসুন্দর আনুষ্ঠানিক দুর্গোৎসব গোঁড়াদের বিরুদ্ধতা নিরসন করতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছিল। বলা বাহুল্য, সহস্র দীন-দুঃখীকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান সে-পূজার অন্যতম বিশেষ অঙ্গ ছিল।...

এদিকে দিন বসে নেই। সপ্তাহকে পিছনে ফেলে সপ্তাহ, মাসকে পিছনে ফেলে মাস অবিশ্রাম, অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বামীজির স্বাস্থ্যও দিন দিনই খারাপ হচ্ছে, দিন দিনই ভেঙ্গে যাচ্ছে সে বজ্রদৃঢ় বিশাল শরীর। এইভাবেই অতীত হয়েছিল সন ১৯০১ খৃীস্টাব্দ—স্বামীজির মর্ত্য-জীবনের শেষ বৎসর।—এই সময়—জাপানের প্রখ্যাতনামা ধর্মযাজক রেভারেন্ড ওডা আর বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ওকাকুরা মঠে এসে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নবজাগরিত প্রাণ-চঞ্চল জাপান তখন দিকে দিকে নব নব বিকাশপথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শিকাগোর বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের পর—জাপানের বিশিষ্ট মনীষিগণ, ধর্মযাজকগণ—সে-দেশেও একটি ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিলেন এবং সেই জন্যই রেভারেণ্ড ওডা এবং ওকাকুরা স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। যদি স্বামীজি তাঁদের ভরসা দেন, যদি তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে সম্মত হন—তবে তাঁরা ঐ বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিতে সাহস পান।...ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও স্বামীজি সম্মত হয়েছিলেন। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, যাবেন তিনি জাপান, যোগ দেবেন কংগ্রেসে। —যথাসময়ে তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

রেভারেণ্ড ওডা উল্লসিত অন্তরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। কিন্তু ওকাকুরা আরও কিছুদিনের জন্য থেকে গেলেন এদেশে। স্বামীজিকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়া দর্শনে যেতে। আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়ে বলেছিলেন স্বামীজি,...

It would give me the greatest pleasure to accompany you to the place where the Tathagata attained Nirvana and after that to go on a pilgrimage to Benares where Buddha first preached his Gospel unto man...

যদিও শরীর তখন তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছে...প্রায় শয্যাশায়ী তাঁর অবস্থা, তবু তিনি বেরিয়ে পড়লেন কাশীধাম দর্শনে, বুদ্ধগয়া দর্শনে। যে কাশী-বিশ্বনাথের দুয়ারে একদা কিঞ্চিন্ন্যুন চল্লিশ বৎসর পূর্বে—কত করুণ প্রার্থনা ও আকুতি জানিয়ে তাঁর মহীয়সী জননী তাঁকে কোলে পেয়েছিলেন, যে বীরেশ্বর শিবের বিশেষ অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন বলে—তাঁর শৈশব নামকরণ হয়েছিল বীরেশ্বর,—আজ জীবনের শেষে সেই কাশীধামে কাশী বিশ্বেশ্বরের শেষ-দর্শনে তাঁর যাত্রা,—নশ্বর দেহে তাঁর শেষ তীর্থভ্রমণ—বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।...

'It was a fit ending to all his wanderings.'...

এই ভ্রমণ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন,...

'Buddhagayā, as it was now the last, had also been the first of the holy places he had set out to visit. And it had been in Benares some few years back,—when he was an unknown monk,—that he had said farewell to one, with the words,—Till that day when I fall on society like a thunderbolt I shall visit this place no more.'

আর কী অব্যর্থভাবেই না এ-উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছিল!

কাশীধাম থেকে, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে—শীতের মধ্যভাগে একেবারে ভগ্নদেহ নিয়ে মঠে ফিরে এলেন স্বামীজি।

গুরুভ্রাতাগণ তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে বিশেষ শঙ্কিত হলেন, উৎকণ্ঠিত হলেন।

বিশেষ অনুরোধে তাঁকে সম্মত করিয়ে যথাসম্ভব তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাদি হল এবং চিকিৎসা চলতে থাকল। কিন্তু স্থায়ী কোন ফলই দেখা গেল না, শরীর তাঁর দিনদিনই মন্দ থেকে অধিকতর মন্দের দিকে চলল। আর ইচ্ছা-মৃত্যু, ধ্যানসিদ্ধ স্বামীজি—মহাপ্রস্থানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অবশিষ্ট দিনগুলি এক এক করে অতিক্রম করতে লাগলেন। বিশেষ চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি সবই ক্রমশঃ তাঁর বন্ধ হয়ে এল।

কিন্তু, দেহ যতই অশক্ত, যতই অপটু হতে লাগল,—অন্তরের তপস্যা-দীপ্তি ততই যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেতে থাকল।...

ধীরে শীত অপগত হল, অপগত হল বসন্ত। তারপর গ্রীষ্মের প্রাখর্য অপসৃত করে বর্ষার সজল কালো মেঘ বাংলার আকাশের ঈশান কোণে প্রথম দেখা দিল। মাঝে মাঝে বর্ষণপাতে মঠভূমি সিক্ত হতে শুরু করল, মাঝে মাঝে গঙ্গার বুকে একটানা বারিপাতের শব্দ উঠতে লাগল—রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্। আর তাদেরই মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরালায় বসে আত্মগতভাবে স্বামীজি শেষ দিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তথাপি, সে অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটল

না, কর্মস্রোত একেবারে বন্ধ হল না। যথাসম্ভব শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দের শিক্ষা দিয়ে, সাহায্য করে—যথার্থ জিজ্ঞাসুদের আশীর্বাদ করে, প্রেরণা দিয়ে—অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতির মধ্য দিয়েই তাঁর অনেক সময় অতিবাহিত হতে থাকল।

What good is this body! Let it go in helping others!
—এ-তাঁর এই সময়েরই একটি উক্তি। আবার, এইকালে অর্থাৎ জুন মাসের শেষদিকে, দেহত্যাগের অব্যবহিত-পূর্বে—পার্শ্ববর্তী জনৈককে উদ্দেশ্য করে একদিন বললেন,...

'মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি। একটা গভীর তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি।'

A great Tapasyā and meditation has come upon me, and I am making ready for death...

একদা বহুকাল পূর্বে স্বামীজির জীবিত-কাল প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছিলেন—'ও যেদিন জানতে পারবে ও কে, সেদিন আর পৃথিবীতে থাকবে না: প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে দেহত্যাগ করে চলে যাবে।' সেই 'স্ব-স্বরূপ জ্ঞাত' হয়ে, পরমধামে মহাপ্রস্থানের শেষ দিন এইরূপেই এগিয়ে এসেছিল এবং যতই এগিয়ে এসেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বিবেকানন্দও ততই যেন অফুরন্ত আনন্দ এবং অব্যাহত শান্তির ঘনীভূত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন সকলের কাছে।

এই সময়টিতে তিনি যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন—তাঁর কর্ম সমাপ্ত হয়েছে। তদীয় মহান গুরুর যে মহতী যুগবার্তা প্রচার করবার সুকঠিন দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল—সে দায়িত্ব সম্যক্ উদ্‌যাপিত হয়েছে। তাই এই সময়,...

'Silently ignoring his world-wide fame he lived unostentatiously in the quiet monastery on the bank of the Ganges, sometimes playing the part of a Guru,...some-

times that of a father, sometimes even that of a school master.'...

এমনি করেই কেটে গেল সে বিরাট, মহান জীবনের শেষকালের দিনগুলি। তারপর, একদা বহুদিন পূর্বে যেদিন অধীনতার নিগড়-বন্ধন ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতার দীপ্ত সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিল—তাঁর প্রথম-কর্মকেন্দ্র আমেরিকা—সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-লেখায়-লিখিত দিন, ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, সমাগত হল পৃথিবীর বুকে।

সেদিন শুক্রবার। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে—যেমন আকাশের সূর্য অস্তাচলশায়ী হল পশ্চিম দিগন্তে, পৃথিবীর সূর্য-সদৃশ বিবেকানন্দও তেমনি সমাধিযোগে প্রবেশ করলেন মহাসমাধির মহাগভীরে। ধ্যানাসনে বসে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে মুখ করে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে—অনন্তের বুকে তিনি করলেন মহাপ্রয়াণ। সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী কোন্ জ্যোতির্লোক থেকে একদা তিনি এ-পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—আবার কর্ম-অন্তে কোন্ লোকেই বা প্রস্থান করলেন তা কেউ জানল না।...শুধু তাঁর নশ্বর দেহ—নশ্বর এই পৃথিবীর বুকেই পড়ে রইল।

*   *   *   *

কালের পরিমাপে অতি অল্পদিন চল্লিশ বৎসর। চল্লিশ বৎসরও ঠিক নয় তার চাইতেও কিছু কম। আবার এর মধ্যে তাঁর কর্মজীবনের পরিধি আরও কম—সাত-আট বৎসর মত বলা যায়। কিন্তু সেই কাল মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলে অভিনব সঞ্জীবনী রসধারা সিঞ্চন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হলেন সে চিন্তা-নায়ক মহামনীষী।

*   *   *   *

বহুযুগ, বহু মন্বন্তর পূর্বেকার সে-কথা। কালের কুজ্ঝটিতে আবৃতপ্রায় বিস্মৃত অতীতের সে-কাহিনী।

একদা তমসাতীরে ব্যাধহস্ত-নিহত ক্রৌঞ্চবিরহীর শোক দর্শনে—কবি-গুরু বাল্মীকির কল্পলোকে যে দিন প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল ছন্দগাথা,

সেদিন—কোন্ মহাজীবনের উদ্দেশ্যে সে অপার্থিব শ্লোকরাশি উৎসৃষ্ট হবে—তা জানবার জন্য দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেছিলেন কবিগুরু...

'সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।'

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় ক'রে সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছেন?

মর্ত্যভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন নারদ—

'দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভি র্যো যুক্তো নরচন্দ্রমা।'

দেবতাদের মধ্যে নেই, স্বর্গধামে নেই...সর্বগুণসমন্বিত এমন পুরুষ এক নরলোকের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ভিন্ন আর কোথাও নেই, কোন লোকে নেই।

কিন্তু কাব্যযুগের দূর অতীতের এই আখ্যায়িকা—সর্বাংশে সত্য কিনা, নিখুঁত বাস্তব ঘটনা কিনা আমরা জানি না।

তবে বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বর্তমানে—এ যুগের মহাকবির ভাষায় প্রাচীন যুগের প্রশ্নটিকে যদি কেউ নূতন করে উত্থাপন করে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—

'—বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক;
কে পেয়েছে সব চেয়ে. কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে. সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—'

তবে নিঃসংশয়ে, নিঃসন্দেহে আমরা বলব—সে নর-চন্দ্রমা পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ।

সর্ব বিপরীত গুণের এমন অপূর্ব সমাবেশ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের এমন জ্বলন্ত, জীবন্ত বিগ্রহ,...

জ্ঞানের দীপ্তিতে ও ভক্তির কোমলতায় এমন মহীয়ান,...

কর্মের কৌশলে ও আধ্যাত্মিক প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও স্নেহে,—ক্ষমায়

ও বীর্যে—এমন পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন জগৎ ইতিপূর্বে আর দেখে নাই, ভাবীকালেও দেখবে কিনা সন্দেহ।

'Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived in this earth at the same time and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet.'

* * * *

একদা নিদ্রামগ্ন, বিগত-বিশ্বাস—অনড়, অচল জাতিকে জাগ্রত্ করবার জন্য, কল্যাণকর্মে প্রবুদ্ধ করার জন্য—আর তারই সঙ্গে হিংসামত্ত পৃথিবীতে—ভোগ-লোলুপ দানবীয় মদমত্ততার মধ্যে শান্তি ও আনন্দের অমৃতনিষেক প্রদান করবার জন্য—কোন্ সমরস জ্যোতির্ময় রাজ্য থেকে—এই মাটির পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় একদা স্বয়ং তিনি একথা বলেছিলেন,—

'এটা খুবই সম্ভব যে এই দেহের পরিধি ভঙ্গ করে, জীর্ণবস্ত্রের মত এই দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবার প্রয়োজন একদিন আমি অনুভব করব। কিন্তু তাতে আমার কার্যপ্রবাহ কিছুমাত্র ব্যাহত হবে না। যতদিন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ নিজের ভাগবৎসত্ত্বা উপলব্ধি করতে না পারবে, যতদিন সে না উপলব্ধি করবে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—ততদিন অলক্ষ্য-লোক থেকে আমি তাদের উদ্দীপ্ত করতে সচেষ্ট থাকবই থাকব।'...

আশাভরা অন্তরে সেই দিব্য, অব্যর্থ আশ্বাসবাণী আজ আমরা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি।

তাঁর দেহত্যাগের পর প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী অতীত হয়েছে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, 'পতন-অভ্যুদয়' কত 'বন্ধুর পন্থার' মধ্য দিয়ে—এই কালের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে ভারতবর্ষ,—উত্তীর্ণ হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে।

সমগ্র মানবসমাজই বা কত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে একালে। কিন্তু, পুঞ্জীভূত কৃষ্ণমেঘে আজও আচ্ছন্ন দেখি তাদের ভাগ্যাকাশ। দ্বেষ-হিংসার কুজ্ঝটিকায় দিক্‌চক্ররেখা দৃষ্টির অন্তরালে আজও দেখি লুক্কায়িত।

ব্যথিত ক্লিষ্ট সমষ্টিপ্রাণ—আজও তাই আর্তরবে সেই অতীত দিনেরই মত প্রার্থনা জানাচ্ছে :

হে অগ্নিময় দিব্য পুরুষ,
হে সনাতন, স্বয়ম্প্রকাশ,
আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও।

...জাতির একান্ত দুর্দিনে, মানবসমাজের ব্যাপক বিমূঢ়তার দিনে—যুগে যুগে যেমন তুমি আগমন করেছ—'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—আজও তেমনি আলোকের পথে, আলোকের রথে হো'ক তোমার শুভ-আবির্ভাব!

'অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি।'